

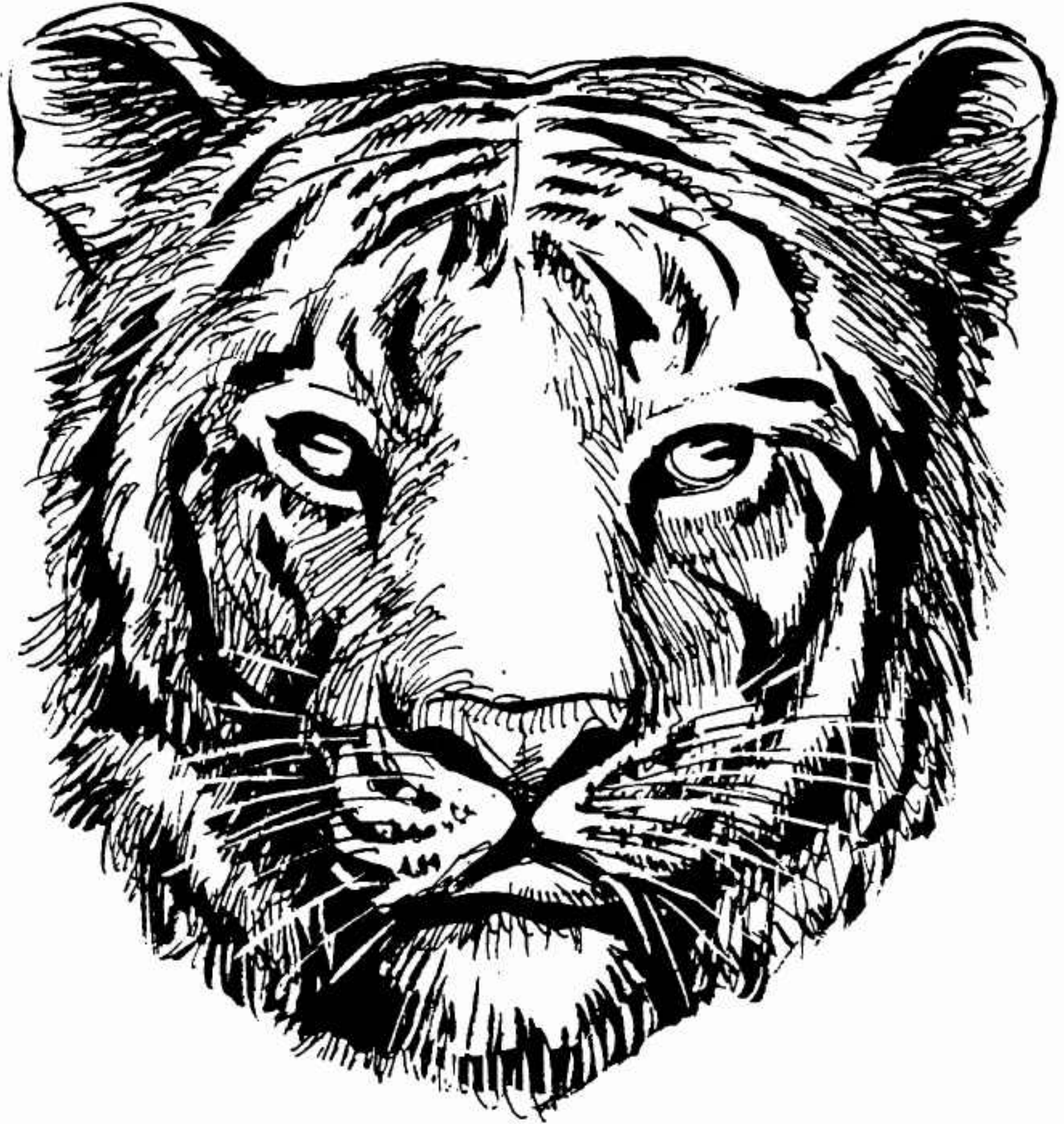
BanglaBook.org

জৈয়ন্তপুর ভয়ঙ্কর

পরেণ ভট্টাচার্য

ভয় যখন ভয়ঙ্কর

পরেশ ভট্টাচার্য



আধুনিক পুস্তক প্রকাশন

৫০, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট,

কলকাতা - ৯

প্রকাশক :-

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

৫০, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট

কল - ৯

প্রথম প্রকাশ :- কলকাতা বইমেলা, ২০০৪

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ :- বিদ্যা অশোক

মূল্য - ত্রিশ টাকা মাত্র

টাইপ সেটিং :-

কম্পিউটার টাইপ জোন্

(সোমা/রঞ্জন/সুদীপ্ত)

২৭/বি, স্নায়ু মিল স্ট্রীট,

বেলঘরিয়া, কল - ৫৬

মুদ্রণ :-

আদ্যাশক্তি প্রিন্টার্স

২৪৩/২সি, এ. পি. সি. রোড,

কল - ৬



উৎসর্গ

ছোট সোনা

অয়ত্তিকাকে

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG



ঃ সূচীপত্র ঃ

❁ ভয় যখন ভয়ঙ্কর	১-৫৭
❁ ভয়ের মুখোমুখি	৫৮-৭৯
❁ জল ডাকাতির মুখোমুখি	৮০-৮৫
❁ এমন ঘটনাও ঘটে	৮৬-৯৩
❁ বিপদ ঘটতে পারতো	৯৪-১০০



ভয় যখন ভয়ঙ্কর

রাত এখন গভীর। শীতের রাত। চারদিকে থমথমে নীরবতা। এই নীরবতার মধ্যে ঝিঝির ডাক বিচিত্র সুর-ঝংকার সৃষ্টি করেছে।

সুন্দরবনের ঝিঙেখালি বন-অফিসের কোণের ছোট ঘরটিতে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন দুই ভাই। ধীমান আর বিমান। ওরা দু'জন একই তক্তাপোশে ঘুমিয়ে আছে।

ঘরে আর একজন আছে। নাম বিশু হাজরা। বন-অফিসে ঠিকা কাজ করে। বিশু ঘুমিয়ে আছে ঘরের মেঝেয়।

হঠাৎই ঘুম ভেঙে গেল ধীমানের। পায়ের নিচে কে যেন সুড়সুড়ি দিচ্ছে।

তড়াক করে উঠে বসলো ধীমান। বালিশের নিচে টর্চ ছিল। জ্বাললো। কিন্তু কোনো কিছুই দেখতে পেল না।

আবার কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে পড়লো সে। ভাবলো, ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখেছে।

কেমন যেন অস্বস্তি ধীমানের মনের মধ্যে। কিছুতেই ঘুম আসছে না। ভাবছে, পায়ের নিচে সুড়সুড়ি দেওয়াটা তো স্বপ্ন না হয়ে সত্যিও হতে পারে।

ঘরের কোণে হারিকেন জ্বালা আছে। জোর কমানো। পাছে, সরাসরি আলো চোখে পড়ে, তাই এক টুকরো পিচবোর্ড দিয়ে আলো আড়াল করে রেখেছে বিশু।

ভাবনার মধ্যে ঘুম-ঘুম তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হলো ধীমান। আবার ঘুম ভেঙে গেল। পায়ের গোড়ালির নিচে কি যেন নড়াচড়া করছে। এবারেও উঠে বসলো। টর্চের আলোয় কিছু দেখতে পেল না।

একবার মনে হলো বিশুদা আর বিমানকে ডাকে। কিন্তু ডাকলো না। ভাবলো, ব্যাপারটা শুনে ওরা হয়তো হাসাহাসি করবে।

শুয়ে পড়লো ধীমান। এবারে গায়ে কম্বল চাপা দিয়ে বালিশে চিবুক রেখে উপুড় হয়ে শুয়েছে।

মাথার কাছে জানালার একটা কপাট নেই। কজা থেকে খুলে গেছে। এখনো লাগানো হয়নি। জানালার খোলা জায়গায় পুরনো তোয়ালে দেওয়া ছিল, সেটাও নেই।

খোলা জানালা দিয়ে দেখা যায় বাইরের টুকরো দৃশ্যপট। জানালার পাশে রয়েছে একটা

সাঁইবাবলা গাছ। একটু তফাতে দুটি নারকেল গাছ। তারপরই গরান খুঁটি আর কাঁটাতারের বেড়া। যেমন তেমন বেড়া নয়, রীতিমতো মজবুত। বেড়ার গায়ে জংলী কাঁটালতা। কাঁটালতায় হলুদ রঙের থোকা থোকা ফুল। মৃদু গন্ধও আছে।

নারকেল গাছের ফাঁক দিয়ে বাইরের ঝোপঝাড় চোখে পড়ে। টুকরো আকাশও দেখা যায়। চাঁদ-জাগা রাত। যদিও ফিকে কুয়াশা, তবু জ্যোৎস্না খুব অস্পষ্ট নয়। ধীমান খোলা জানালা দিয়ে দেখছে বাইরের দৃশ্যপট। বেশ লাগছে দেখতে। মনে হয় ক্যানভাসে আঁকা সুন্দর ছবি দেখছে।

পায়ে সুড়সুড়ির কথা এখন আর মনে নেই ধীমানের। সে ডুবে আছে সত্যি ছবির মধ্যে। টিকটিকি ডেকে উঠলো। চমক ভাঙলো ধীমানের। ভালোই হলো। মনে মনে ঠিক করলো দরজা খুলে বাইরে যাবে। দেখবে জ্যোৎস্না রাতের সৌন্দর্য।

উঠে বসলো ধীমান। হঠাৎ চোখে পড়লো তক্তাপোশের পায়ার কাছে দুটো চোখ জ্বলছে। টর্চটা হাতে নিতে গেল তাড়াতাড়ি। মেঝের ওপর পড়ে গেল টর্চ। শব্দে ঘুম ভেঙে যায় বিমানের। ধীমানকে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলে, কিরে ভাই, বসে আছিস কেন?

ওই দ্যাখ। ধীমান বললে, দেখেছিস? দুটো চোখ কি রকম জ্বলছে। তাই তো রে। বিমান বললে, দে তো টর্চটা। দিচ্ছি। ধীমান বললে, টর্চটা পড়ে গেছে মেঝেয়।

হাত বাড়িয়ে টর্চটা তুলে নিলে ধীমান। আলোয় দেখলো, বিড়ম্বার আদরের কালো রঙের হলো বিড়াল কালুয়া বেশ মেজাজ নিয়ে বসে আছে তক্তাপোশের পায়ার কাছে। দুই ভাই হাসিতে ফেটে পড়লো।

ওদের হাসির দাপটে ঘুম ভেঙে গেল বিশুর। বললে, কি হলো, রাতদুপুরে অতো হাসির ঘটনা কেন? হাসছি কেন? ওই দ্যাখো তোমার আদরের কালুয়া। বিমান বললে, বাপরে ওই চোখ দুটো কিরকম জ্বলছিল। সত্যিই ওরা বাঘের মাসি।

বিশু হাই তুলে আড়ামোড়া ভেঙে বললে, ও মাসিও নয়, মেসোও নয়, ও হলো বাঘবাবার মাসতুতো ভাই, বুঝেছো।

বিমান বললে, ব্যাটা বসে আছে দ্যাখো কেমন মেজাজে। বাঘমসলের মাছ খেয়ে চেহারাটা বাগিয়েছে বটে। বুঝলে বিশুদা, জঙ্গলে ছেড়ে দিলে ও তোমাদের বাঘবাবার সঙ্গে লড়ে যাবে।

কালুয়া এতক্ষণে বড় বড় গোঁফ কাঁপিয়ে যেন কিছুটা বিরক্তি মিশিয়ে আওয়াজ করলো, ম্যাও।



BanglaBook.org

ধীমান এবারে তার পায়ে সুড়সুড়ি লাগার একটা কারণ খুঁজে নিলে মনে মনে। নিশ্চয়ই কালুয়ার শীত করছিল, তাই ও নীরবে পায়ের দিক থেকে কম্বলের মধ্যে ঢোকান চেষ্টা করছিল। ঢুকতে না পেরে তত্তাপোশের পায়ার কাছে অমন করে বসে আছে। বিড়ালরা যে শীতকাতুরে

এ কথা সবাই জানে।

কিন্তু পায়ের সুড়সুড়ির ব্যাপারটা প্রকাশ করলো না। তাতে হয়তো বিমান হাসাহাসি করবে।

বিমান জানালার ধারে গেল। বাইরের দিকে তাকালো। জ্যোৎস্নার রাত। শিশির ভেজা গাছের পাতায় পাতায় পড়েছে জ্যোৎস্নার আলো। শিশিরবিন্দু নয়, যেন মুক্তাবিন্দু।

বিমানের মন আনচান করে উঠলো বাইরে যাবার জন্যে। বিশুদাকে বললে, চলো না, বাইরে যাই, টাওয়ারে উঠি।

বিশু বললে, না, বাইরে যাওয়া ঠিক নয়, তাছাড়া সাহেব যদি জানতে পারেন, তাহলে আমার চাকরি খতম।

ধীমানের মন উসখুস করে উঠলো বাইরে যাওয়ার জন্যে। বললে, আরে বিশুদা, তোমাদের রানা সাহেব তো আমাদের কাকা, মানে ছোটকা।

বিশু বললে, তা হোক, আমরা বনের বাঘকে যত না ভয় করি, তার চেয়ে বেশি ভয় করি রানা সাহেবকে। তোমরা তো তোমাদের ছোটকাকে চেনো, জঙ্গল অফিসের রানা সাহেব হিসাবে তো জানো না। ওনার মুখোমুখি হলে বনের বাঘও পিছু হটে।

বিমান বললে, আরে বিশুদা, ভয় কি। আমরা তো কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে যাবো না। শুধু টাওয়ারটার ওপরে উঠে রাতের বন দেখবো।

বিশু বললে, এই তো তিন দিন হলো এসেছো, এর মধ্যে কতবার টাওয়ারে উঠেছো বল তো?

তা অনেকবার উঠেছি। ধীমান বললে, কিন্তু রাতে তো উঠিনি। এই জোছনা রাতে সুন্দরবনের রূপ দেখতে বড্ড ইচ্ছে করছে।

বিশু বললে, আমার কথা ছেড়ে দাও, গেটের মুখে সান্দ্রীরা পাহারায় আছে, তুমি যদি দেখতে পায়?

বিমান বললে, আরে তারা তো খুব ভালো লোক। আমাদের সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেছে। আমরা তাদের বলে, তারপর টাওয়ারে উঠবো।

বিশু বললে, সে না হয় আমিই বলে আসছি। কিন্তু একটা কথা, এক ঘন্টার মধ্যেই টাওয়ার থেকে নেমে ভালো ছেলের মতো ঘরে ঢুকতে হবে।

তাই হবে, বিমান বললে, এক ঘন্টার মধ্যে আমরা ফিরে আসবো।

ঠিক আছে, বিশু বললে, তোমরা সোয়েটার গায়ে দিয়ে নাও, আমি সান্দ্রীদের বলে ম্যানেজ করে আসছি। তবে কি জানো, একটা ভয় থেকেই যাচ্ছে।

কিসের ভয়? ধীমান জিজ্ঞেস করলো।

রানাবাবু স্পীডবোট নিয়ে বেরিয়েছেন। যদিও তিনি গেছেন নেতি ধোপানির জঙ্গলের দিকে, তবু সাহেবের খেয়াল তো, হয়তো আচমকা ফিরে এলেন।

ধীমান বললে, আরে বিশুদা, অতো ভাবতে গেলে কি চলে। তাছাড়া ছোটকাকে তোমাদের চেয়ে আমরা কম জানি না, অমন মানুষ হয় না। তোমরা ওঁকে ভয় পাও কেন বুঝতে পারছি না। যাক, তুমি যাও, সাস্ত্রীদের বলে এসো।

বিশু বললে, আর বলে আসবো কি, চলো একসঙ্গেই বেরিয়ে পড়ি।

আর তিন দিন বাদেই পূর্ণিমা। কুয়াশার চাদরের আড়াল থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে চাঁদ। চাঁদের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল চারদিকের দৃশ্যপট। আর কুয়াশার চাদর জড়ানো বলে সবকিছু যেন আরো অপরূপ হয়ে উঠেছে।

ধীমান আর বিমান টাওয়ারে উঠেছে বিশুকে নিয়ে। বেশ উঁচু টাওয়ার। কাঠের তৈরি। টাওয়ারের ওপরে একজন সাস্ত্রীও থাকে।

টাওয়ার থেকে জ্যোৎস্না-ঝরা রাতের সুন্দরবনের দৃশ্যপট দেখে দুই ভাই মুগ্ধ হলো। মনে হয় এ এক স্বপ্নের দেশ।

নিবিড় বনভূমি। গাছের পাতায় পাতায় শিশিরবিন্দু। শিশিরবিন্দু নয় যেন মণিমুক্তা ছড়ানো।

টাওয়ার থেকে দূরন্ত নদী রায়মঙ্গলও স্পষ্ট দেখা যায়। নদীর বুকে কুয়াশা যেন আরো ঘন। দূর থেকে হঠাৎ মনে হয়, ওখানে আকাশ, নদী একাকার হয়ে গেছে।

দুই ভাই অবাক চোখে চারদিকের দৃশ্যপট দেখছে। হঠাৎ কানে এলো বুক-কাঁপানো গুরুগম্ভীর আওয়াজ। কতকটা শাঁখের আওয়াজের মতো। রাজা বাঘ ডাকছে বনের ভিতর থেকে।

আজই প্রথম বাঘের ডাক শুনলো ধীমান আর বিমান। তবে এর আগে সার্কাস দেখতে গিয়ে বাঘের ডাক শুনেছে। তবে সে ডাক এমন গম্ভীর নয়।

সাস্ত্রী বটুক ওঝা বললে, কি, কেমন লাগছে তোমাদের?

ধীমান বললে, ভালো।

বিমান জিজ্ঞেস করলে, তুমি বাঘ দেখেছো সাস্ত্রী কাকা?

সাস্ত্রী বটুক না হেসে পারলো না। বললে, সাস্ত্রী কাকা নই, বটুক কাকা, বুঝলে। হ্যাঁ, কি যেন জানতে চাইলে— বাঘ দেখেছি কিনা? বনে বনে আমাদের বাক্স, শুধু বাঘ কেন, অনেক রকম পশু-পাখি দেখেছি। বাঘ, হাতি, হরিণ, নেকড়ে, চিতা, বুনো শূয়োর—আরো কত কী। কিন্তু সুন্দরবনে হাতি, নেকড়ে, চিতা বাঘ নেই। তবে যাই দেখি না কেন, সুন্দরবনের রাজা বাঘের তুলনা নেই। যেমনি সুন্দর, তেমনি ভয়ংকর। জানো বছরখানেক আগে এখানে এক অদ্ভুত ঘটনা

ঘটেছিল।

দুই ভাই কৌতুহলী হলো।

বটুক বলতে লাগলো ঘটনার কথা। সে ঘটনার কথা এই বন-অফিসের সবাই জানে। সবাই স্বচক্ষে দেখেছে। এমন কি বাইরে থেকেও সেই সময় প্রচুর লোক আসতো এই ঝিঙেখালি অফিসে।

কলকাতা থেকে খবরের কাগজের লোকও এসেছিল, এসেছিল দূরদর্শনের লোক। জানো, একদিন গভীর রাতে, এই অফিসের মানুষ শুনতে পেল বাঘের ডাক। অবশ্য সেটি বাঘ ছিল না, ছিল বাঘিনী। আর তার সেই ডাকের মধ্যে ভয়ংকর ভাব ছিল না। ছিল অন্য এক সুর।

অবাক কাণ্ড। সেই গভীর রাতে অফিসের যত লোক, সবাই দেখলো একটা বাঘিনী তার দুটো বাচ্চা নিয়ে চলে এসেছে কাঁটাতারের বেড়ার ধারে।

সে কি! কেন?

ভয়ে, বাঘের ভয়ে। কিছু কিছু বাঘ আছে, যারা তাদের বাচ্চাকে মেরে ফেলে। সেই জন্যে বাঘিনী তার বাচ্চাদের নিয়ে পালিয়ে এসেছে বন-অফিসের কাছে। যাতে বাঘের হাত থেকে রক্ষা পায় বাচ্চা দুটো।

রানা সাহেব জঙ্গলের জীবজন্তুকে ভালোবাসেন। তিনি দুজন সান্ত্বীকে নির্দেশ দিলেন, রাইফেল নিয়ে ওখানে পাহারা দিতে। বাঘ যেন কোনো ভাবে এদিকে ঘেঁষতে না পারে। আর নিজে কাঁটাতারের বেড়ার এক জায়গায় মাটি সরিয়ে দিয়ে বাচ্চা দুটোর ভেতরে ঢোকান পথ করে দিলেন।

বাচ্চা দুটো নিতান্তই শিশু। তারা তাদের বাঘিনী মায়ের কাছে থাকতে চায়। তবু এক সময় দেখা গেল বাঘিনী তার সন্তানদের মাথা দিয়ে ঠেলে দিচ্ছে কাঁটাতারের বেড়ার এধারে। কিন্তু বাচ্চা দুটো কিছুতেই ভেতরে ঢুকবে না।

রানা সাহেব তখন সেখানে দাঁড়িয়ে। তিনি হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসলেন, বাচ্চা দুটোকে হাত দিয়ে টেনে ভেতরে ঢুকিয়ে নিলেন। আশ্চর্য। বাঘিনী কিছুই করলো না। তার হাবভাব দেখে বোঝা গেল সে যেন খুশিই হয়েছে। তারপর কি হলো জানো?

ধীমান আর বিমান একসঙ্গে বলে উঠলো, কি হলো বটুক কবচ? বটুক বলতে আরম্ভ করলো তার পরের কথা। রানা সাহেব বুঝতে পারলেন বাঘিনী চায় তার বাচ্চা দুটো কাঁটাতারের বেড়ার ভেতরেই থাক। শুধু মাঝে মাঝে তার কাছে আসুক। রানা সাহেব বাচ্চা দুটোকে আশ্রয় দিলেন। তাদের নাম রাখলেন দীপ আর আলো।

দীপ আর আলো ভেতরে ঢুকলে তাদের যাওয়া-আসার পথ বন্ধ করে দেওয়া হতো একটা

তত্ত্বা দিয়ে। কাঁটা-তারের বেড়ার ভেতর মনের আনন্দে খেলা করতো বাচ্চা দুটো। কিন্তু ক্ষিদে পেলেই তারা কাঁটাতারের বেড়ার ধারে গিয়ে মুখ দিয়ে আওয়াজ করতো, মাটি আঁচড়াতো। তখন তত্ত্বার বাধা সরিয়ে নেওয়া হতো। আলো আর দীপ চলে যেতো মায়ের কাছে। বাঘিনী মা তাদের গা চেটে দিতো, নানাভাবে আদর করতো। অনেক সময় তাদের সঙ্গে খেলাও করতো। তারপর আবার মাথা দিয়ে তাদের ঠেলে পাঠিয়ে দিতো কাঁটাতারের ভেতরে। বাঘিনী ঠিকই বুঝেছিল জঙ্গলের অফিসের কাছে থাকাই বাচ্চা দুটোর পক্ষে নিরাপদ।

ধীমান জিজ্ঞেস করলো, বাঘিনী কি খেতো?

কি আবার খাবে! বাঘে কি খায় তাও বলে দিতে হবে। বটুক বললে, বাঘিনীর জন্যে রোজ পলিথিনের প্যাকেটে মাংস দেওয়া হতো। তারপর শোনো বলে চুপ করে গেল বিশু।

কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে বেশ বড়ো একটা পুকুর। পুকুরের তিন পাড়ে বন-বিভাগের লাগানো ইউক্যালিপটাস গাছ। আর পুকুরের পাড় বরাবর চারদিকেই নারকেল গাছের সারি। কিছুটা দূরেই জঙ্গল। মাঝে মাঝে বনের হরিণরা পুকুরের মিষ্টি জল পান করতে আসে। ইউক্যালিপটাস বনেও হরিণের দেখা মেলে প্রায়ই।

বটুক বেশ কিছু সময় চুপচাপ রইলো। তারপর বললে, ওই যে পুকুরটা দেখছো, ওই পুকুরের পূর্বপাড়ে বাঘ আসতো। আর বাঘ এলেই বাঘিনী গর্জে উঠতো। সাস্ত্রীরা তখনই বুঝতো কাছাকাছি কোথাও বাঘের আবির্ভাব হয়েছে, তারা সতর্ক হতো। রাইফেল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো বাঘিনীর কাছাকাছি। একদিন আমি ডিউটিতে ছিলাম। বাঘিনী তখন দীপ আর আলোকে দুধ খাওয়াচ্ছিল, সেই সময় হঠাৎ সে ভয়ংকর ভাবে গর্জন করে উঠলো। তখন অন্ধকার রাত। চারদিকে টর্চ ফেলেও কিছু দেখতে পেলাম না। অথচ বাঘিনী গর্জন করে চলেছে একটানা। দীপ আর আলোকে আমিই হাত বাড়িয়ে ভেতরে টেনে নিতে গেলাম। পারলাম না। তারা নাগালের বাইরে। এদিকে আরো সাস্ত্রী এসে গেছে। রানা সাহেবেরও ঘুম ভেঙে গেছে। তিনিও দৌঁড়িয়ে এসেছেন। আশ্চর্য মানুষ রানা সাহেব, ভয় কি তা জানেন না। দু'জন সাস্ত্রীকে নিয়ে পুকুরের বাইরে চলে গেলেন। আমি তখন বাঘিনীর কাছে। কাঁটাতার আর গরানখুঁটির বেড়ার ধারে। একদিকে আমি, অন্যদিকে বাঘিনী। হঠাৎ দেখলাম, বাঘিনী ছুটছে কাঁটাতারের বেড়ার ধার দিয়ে। যারা টাওয়ারের ওপর ডিউটিতে ছিল, তাদের মধ্যে কেউ একজন চিৎকার করে উঠলো, স্যার, আপনার পিছনে স্যার—

ঠিক সেই মুহূর্তে শোনা গেল বাঘের গর্জন, তার সঙ্গে রাইফেলের গুলির আওয়াজ। কিন্তু কোনো কিছুই দেখা গেল না। বাঘিনী ছুটেছিল, সে আবার ফিরে এলো দীপ আর আলোর কাছে। এরপর দীপ আর আলো নিজে থেকেই ঢুকলো কাঁটাতারের বেড়ার ভেতরে। বাঘিনী তখন

নিশ্চিত হলো।

ধীমান আর বিমান অবাক হয়ে শুনছে বটুক ওঝার গল্প। গল্প নয়, সত্যি কাহিনী।

বটুক বলছে, এর পরেও মাঝে মাঝে বাঘের গর্জন শোনা যেতো পুকুরের পূর্ব দিক থেকে। বাঘিনীও থেকে থেকে গুমরে উঠতো, গর্জন করতো। এদিকে দীপ আর আলোও ক্রমশ বড় হচ্ছে। শেষে এমন একদিন এল যখন রানা সাহেব দেখলেন ওদের আর কাঁটাতারের ভেতরে অবাধে চলাফেরা করতে দেওয়া ঠিক নয়। যে কোনো সময় কাউকে কামড়ে দিতে পারে। তখন তিনি বেড়ার কাছে খানিকটা জায়গা ঘিরে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। দীপ আর আলো খেয়ালখুশি মতো সেখানে আসে। তখন তারা একটু-আধটু মাংস খেতে শিখেছে। মায়ের সঙ্গে খায়ও।

এভাবে প্রায় মাসখানেক এখানে বাঘিনীটি ছিল দীপ আর আলোকে নিয়ে। তারপর একদিন তাদের নিয়ে বাঘিনী চলে গেল জঙ্গলে।

আর আসেনি? বিমান জিজ্ঞাসা করলে।

না। বলেই বটুক বললে, জানো, দীপ আর আলো চলে যেতে আমাদের সবার মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মনে হতো ওরা যদি থাকতো, খুব ভালো হতো। কিন্তু তারা থাকবে কেন? তারা বনের পশু, বনে থাকতেই চায়। দীপ আর আলো চলে যাওয়ার পর রানা সাহেব বলেছিলেন, আমরা মানতে চাই না, কিন্তু একটা কথা সবারই মনে রাখা দরকার, বনের পশু-পাখিদেরও আমাদের মতো মন আছে। এই যে আমরা বাঘকে হিংস্র বলি, এটা ঠিক নয়। প্রকৃতি ওদের মাংসাশী করেছে। নয়তো ওদেরও স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা সবই আছে। এই যে বাঘিনী দুটো বাচ্চাকে নিয়ে এখানে এসেছিল, সে তো বুঝেছিল জঙ্গলের অফিসই তাদের নিরাপদ আশ্রয়। কই, যে মানুষকে ওরা শত্রু ভাবে, সেই মানুষের হাতে রাইফেল দেখেও তো বাঘিনী ভয় পেতো না। সে কিন্তু বিশ্বাস করেছিল আমাদের।

চাঁদ ডুবছে আকাশের কোণে। রাত শেষ হতে আর দেরি নেই। টাওয়ারে বসে সাদ্ধী বটুক ওঝা আরো অনেক গল্প শোনালো, সবই জঙ্গলের গল্প। ধীমান আর বিমান অবাক হয়ে শুনলো সে-সব।

আরো গল্প শোনার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু বাদ সাধলো বিশু। বললে, এই আর নয়, এবারে চলো। ঘরে গিয়ে শান্ত ছেলের মতো শুয়ে পড়ো। আর গল্প যদি শুনতে চাও, আমি শোনাবো। তবে আজ এই শেষ রাতে নয়, এখন বাকি রাতটুকু ঘুমিয়ে নাও। নই কাল আমাদের বন দেখতে যাওয়ার কথা।

বিমান জিজ্ঞাসা করলে, কাল কখন আমরা যাবো বিশুদা?

বিশু বললে, রানা সাহেব যখন ব্যবস্থা করবেন তখন যাবে। তবে জানি না আমার যাওয়া



হবে কিনা।

ধীমান বললে, কেন, তুমি যাবে না বিশুদা?

বিশু বললে, সাহেব যদি যেতে বলেন তোমাদের সঙ্গে, তা হলেই যাবো। নয়তো নয়।

কথা বলতে বলতে ঘরে এলো ওরা। ঘরে ঢুকেই দেখলো, কালুয়া তক্তাপোশের কোণে অদ্ভুত ভঙ্গিতে বসে গাঁ গাঁ করছে।

বিশুর আদরের বিড়াল কালুয়া। বাইরে থেকে ঘরে এলেই ছুটে এসে বিশুর পায়ে মাথা ঘষতে আরম্ভ করে। হঠাৎ কি হলো তার?

বিশু জিজ্ঞেস করে, কি রে কালুয়া, অমন গাঁ গাঁ করছিস কেন? রাগে তোর গায়ের লোম তো খাড়া হয়ে উঠেছে। কার ওপর রাগ?

কালুয়া এবারে ফাঁস ফাঁস আওয়াজ করতে লাগলো। বিশুর কেমন দন্দ লাগলো। নিশ্চয়ই কোনো কিছু দেখেছে, নয়তো অমন করবে কেন?

তক্তাপোশের কাছে গিয়ে কালুয়ার পিঠে হাত বুলাতে গেল বিশু। কালুয়া ভীষণ রেগে ছিল। সে থাবা মারতে গেল বিশুর হাতে। আর সেই মুহূর্তে দেখা গেল বিছানার চাদরের নিচে কি যেন নড়ছে।

হাত দিয়ে চাদরের কোণ তুলে ধরেই পিছু হটলো বিশু। একটা সাপ হিলহিলিয়ে নিচে নেমে এলো। ধীমান আর বিমান টেবিলের ওপর উঠে পড়লো। কালুয়া তড়াক করে লাফিয়ে সাপটার লেজে থাবা মারলো।

সাপটা কালাচ সাপ। ফণা না ধরলেও ভয়ানক বিষাক্ত। ঘরের কোণে বাঁশের লাঠি ছিল। সড়কিও ছিল। লাঠিটা হাতে নিয়ে সজোরে সাপটার মাথায় মারলো বিশু। সাপটা আহত হয়ে ছটফট করতে লাগলো।

আরো বারকয়েক লাঠির ঘা মারতে সাপটা নিস্তেজ হয়ে গেল। কিন্তু তখনো তার লেজের দিকটা নড়ছে।

কালুয়া এবারে বিশুর পায়ে মাথা ঘষতে লাগলো।

এখন ধীমান ভাবছে পায়ের নিচে গোড়ালির কাছে সুড়সুড়ির কথা। এই সাপটাই তাহলে ছিল চাদরের নিচে। কালুয়ার জন্যেই বেরোয়নি। কথাগুলো মনে হতেই ধীমানের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো।

বিমান বললে, দেখলে কেমন গা শিরশির করছে। চলো বিশুদা, সাপটা ফেলে দিয়ে আসি।

সাপটাকে পোড়াতে হবে। বিশু বললে, তবে এমন নয়, রাত শেষ হোক, তারপর।

রাত শেষ হয়ে আসছে। কুয়াশার মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে পূর্বের আকাশে আলোর আভাস।



লাঠির মাথায় সাপটাকে নিয়ে বাইরে এলো বিশু। পিছনে ধীমান আর বিমান।

বাইরে বেরোতেই দেখা গেল রানা সাহেব, মানে ধীমান, বিমানের ছোটকা বিভূতি রানা বাবলার দাঁতন মুখে দিয়ে অফিস প্রাঙ্গণে পায়চারি করছেন। লাঠির ডগায় সাপ দেখেই বলে উঠলেন, আরে এ যে দেখছি কালাচ সাপ। কোথায় ছিল?

ধীমানই বলে উঠলো, আমার বিছানায়, পায়ের কাছে চাদরের নিচে।

রানা বললেন, বলিস কি!

ধীমান বললে, জানো ছোটকা, আমার পায়ের নিচে সুড়সুড় করছিল, তাইতে ঘুম ভেঙে যায়।

রানা বললেন, বুঝেছি। তারপর আর না ঘুমিয়ে টাওয়ারে উঠেছিলে, তাই তো।

ছোটকা, তুমি-বলেই চুপ করে গেল বিমান।

বেরিয়েছিলাম বন টহল দিতে, রানা বললেন, ভাবছিস, কখন ফিরলাম, কি করে জানলাম-এই তো? যাকগে সে কথা, এখন বল রাতে চাঁদের আলোয় বন কেমন লাগলো?

বিমান বললে, চমৎকার ছোটকা।

ধীমান বললে, আমার মনে হচ্ছিল সুন্দর একটা স্বপ্নের জগৎ দেখছি।

সত্যি স্বপ্নের জগৎ। রানা বললেন, এখন বুঝতে পারছিস তো কেন আমি ইট, কাঠ, লোহা, সিমেন্টের শহরে থাকতে চাই না।

কথার মধ্যে আরো কয়েকজন এসে গেছে। কালাচ সাপটা দেখলো সবাই। এখানে যারা থাকে তাদের সাথে সাপ নতুন কিছু নয়। তবে এখন শীতকাল, এই সময়ে সাপ খুব বেশি দেখা যায় না।

রানা বললেন, তোরা যদি টাওয়ারে না গিয়ে ঘরে থাকতিস, তাহলে হয়তো একটা বিপদ ঘটে যেতো। জানিস, অলক্ষ্যে অনেক সময় এমন অনেক ঘটনা ঘটে, যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে কারণ খুঁজে বের করা যায় না।

রানা সাহেব আর দাঁড়ালেন না। এগিয়ে চললেন জেটির দিকে। প্রতিদিন জেটের কাঠের জেটির ওপর দিয়ে দাঁড়ানো তাঁর অভ্যাস।

রায়মঙ্গলের ধারে ঝিঙেখালি জঙ্গল অফিসের জেটিঘাটে বনবিভাগের স্পীড-বোট বাঁধা। এই বোটে আজ ধীমান, বিমান বেড়াতে যাবে সুন্দরবনের গভীরে।

স্পীডবোটের চালক গোলাম রহমান। বয়স যদিও তার পঞ্চাশ ছুই ছুই কিন্তু চেহারা এখনো তরতাজা যুবকের মতো। অমন মজবুত শরীর এই অফিসে আর কারো নেই।

ক'দিন ছুটিতে ছিল গোলাম। গতকাল রাতে এসেছে। এখনো তার দেখা হয়নি রানা সাহেবের

ভাইপো দুটির সঙ্গে। রানা সকালেই বলে দিয়েছেন ভাইপো দুটিকে জঙ্গল এলাকা ভালো করে ঘুরিয়ে দেখাতে। কিন্তু যেখানেই যাক, যেন সন্ধ্যের আগে ফিরে আসে।

বেলা এখন নটা। গোলাম রহমান রওনা হবার জন্যে তৈরি।

ধীমান, বিমানের সঙ্গে তাদের বিশুদা তো আছেই, আর যাচ্ছে সান্থী ভজগোবিন্দ তেওয়ারি ও বটুক ওঝা। যদিও বটুকের রাত ডিউটি ছিল, তবু সে নিজে থেকেই যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে।

দুপুর আর বিকালের খাবার পানীয় জল, সবই নিয়েছে বিশু। খাবারদাবার সঙ্গে রাখতেই হবে। বনের রাজ্যে ঢুকলে কোথাও কিছু মিলবে না। আর জলের দেশ হলে হবে কি, সে জল মুখে দেবার উপায় নেই। এতই নোনা।

ধীমান আর বিমান আসছে। সুন্দর ফুটফুটে দুটি কিশোর। পিছনে রাইফেলধারী দুই বনরক্ষী ভজগোবিন্দ আর বটুক।

রানা সাহেবের সঙ্গে বিশুও আসছে। রানা সাহেব যাবেন না, জেটিঘাট অদি আসবেন।

গোলাম রহমান অবাক চোখে দুই ভাই-এর দিকে তাকিয়ে। দুই ভাই পাশাপাশি হেঁটে আসছে। দেখতে একই রকম। কে ধীমান, কে বিমান হঠাৎ চিনে নেওয়া যায় না। তবে মিলের মধ্যেও কিছু অমিল থাকে। প্রকৃতির নিয়ম এমনই, দুটি মানুষ কখনো এক হয় না। শুধু মানুষ কেন, কোনো দুটি প্রাণী, পাখি কিংবা অন্য কোনো কিছু এক হয় না।

একটু খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায় কে ধীমান, কে বিমান। ধীমানের কপালে পাশাপাশি দুটি তিল আছে। আর বিমানের চিবুক একটু সরু। ওরা যমজ ভাই। কয়েক মিনিটের ব্যবধানে দু'জনের জন্ম। মিনিটের হিসাবে ধীমান বড়। দুই ভাইয়ের দারুণ ভাব। একে অপরকে ভাই বলে ডাকে।

দুই ভাই-এর চেহারা যত মিলই থাকুক, স্বভাবে কিন্তু দারুণ অমিল। ধীমান শান্ত, স্থির, আর বিমান চঞ্চল ও অস্থির।

লেখাপড়ায় দু'জনেই সমান। একই ক্লাসে পড়ে। পরীক্ষায় এরা প্রথম ও দ্বিতীয় হবেই। তবে কে কোনবার প্রথম হবে তার ঠিক নেই। এখন ওরা অষ্টম শ্রেণীতে পড়ছে ঝাড়গ্রাম স্কুলে।

যেমন লেখাপড়ায়, তেমনি খেলাধূলা আর সাঁতারেও ওরা প্রবীণ। এখন ক্যারাটে শিখছে দু'জনে। এছাড়া রয়েছে ঘুরে বেড়ানোর নেশা। দুই ভাই বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে প্রায়ই বেরিয়ে পড়ে এখানে-ওখানে।

এবারেও ওরা ঠিক করেছিল বন্ধুদের নিয়ে আসবে সুন্দরবনে। কিন্তু তাদের অভিভাবকেরা আসতে দেননি। তাঁদের কথা হলো, ওখানে জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ, এছাড়া সাপখোপ তো

আছেই, ওখানে যাওয়া ঠিক নয়।

শেষটা ছোটকার সঙ্গে দুই ভাই চলে এসেছে। বন্ধুরা কেউ আসেনি বলে তাদের মন একটু খারাপ হয়েছিল।

জঙ্গল অফিসের একান্তে কাঁটাতারের বেড়ার মধ্যে একটা চালায় বনবিবি, দক্ষিণরায় আর শা-জঙ্গলির মূর্তি। এই তিন লৌকিক দেব-দেবীকে এখানকার মানুষ বিশ্বাস করে। যখনই তারা নদীপথে কোথাও যায়, কিংবা জঙ্গলে ঢোকে—তখনই এই দেব-দেবীকে প্রণাম করে যায়।

বনবিবির মূর্তিটি অন্যান্য দেবী প্রতিমার মতো। দক্ষিণরায় কিন্তু ঠিক মানুষের মতো। পরনে ধুতি-জামা, কাঁধে বন্দুক, পায়ে শূঁড়তোলা জুতো তো আছেই। শা-জঙ্গলিকে নিয়ে নানা বিচিত্র কাহিনী এখানকার লোকের মুখে-মুখে শোনা যায়।

সাড়ে নটা বাজে।

এবারে সবাই স্পীডবোটে উঠলো। গোলাম রহমান যেমন দুঃসাহসী তেমনই একগুঁয়ে। তবে স্পীডবোটের চালক হিসাবে দারুণ দক্ষ।

রানা সাহেব বারবার গোলাম রহমানকে একই কথা মনে করিয়ে দিলেন, যেন কোনো রকম ঝুঁকি না নেয়। আর কোথাও কোনো কারণে যেন কেউ ডাঙায় না নামে।

স্পীডবোট স্টার্ট দেবার মুহূর্তে রানা সাহেব বললেন, রহমান ভাই, আমি দেখতে চাই সন্ধ্যার মধ্যে তোমার স্পীডবোট এসে দাঁড়িয়েছে জেটিতে।

ওই এক মানুষ গোলাম রহমান। কোনো কথাতেই সহজে কথা বলবে না। তবে সব কথাই মন দিয়ে শুনবে।

রানা সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, কি, আমার কথা মনে থাকবে তো?

গোলাম রহমান শুধু মাথাটা একটু নাড়লো। কোনো কথা বললে না। তবে স্পীডবোটে স্টার্ট দিয়ে গোলাম রহমান একবার রানা সাহেবের দিকে তাকালো। রানা সাহেব হাত নাড়লেন।

স্পীডবোটের ইঞ্জিন গুমরে উঠলো। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চলতে শুরু করলো স্পীডবোট। গোলাম রহমানের মুখে এই প্রথম কথা শোনা গেল। ধীমান আর বিমানকে উদ্দেশ্য করে বললে, ঠিক-ঠাক বসে থাকবে ভাইয়েরা। একদম এদিক-ওদিক করবে না।

স্পীডবোট কাজল ছুটছে রায়মঙ্গলের বুকুর ওপর দিয়ে। নদীতে এখন জোয়ার, বোট ছুটছে স্রোতের বিপরীতে। দুরন্ত তার গতি। জল ছিটকে ছিটকে উঠছে স্পীডবোটে।

ধীমান আর বিমানের কাছে এ এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার মতো। কাজল ছুটছে ঝড়ের গতিতে। এমন ভাবে জল কেটে যাচ্ছে, সামনের দিকে তাকালে মনে হচ্ছে ফোয়ারা। গোলাম রহমান একভাবে বসে আছে। কোনো দিকে ফিরে তাকাচ্ছে না।

এখনো জঙ্গল এলাকায় ঢোকেনি তারা। এখানে রায়মঙ্গলের একদিকে জঙ্গল, অন্যদিকে গ্রাম-জনপদ।

বটুক ওঝা রাইফেল কোলের ওপর রেখে সুন্দরবনের গল্প শোনাচ্ছে। কিন্তু গল্প শোনায় মন নেই ধীমান আর বিমানের। তাদের দু'চোখে দেখার নেশা।

জঙ্গলের পাড় ঘেঁষে ছুটছে কাজল। রূপালি রোদুরে ঝলমল করছে রায়মঙ্গলের জল। এখন শীতকাল, নদী শান্ত, কিন্তু তরঙ্গহীন নয়।

নদীতে আরো নৌকা যাওয়া-আসা করছে। তবে বেশির ভাগই চলেছে শ্রোতের টানে। উজানেও চলেছে কিছু নৌকা। মাঝে মাঝে এক-একটা লঞ্চও চোখে পড়ছে। যাত্রীবাহী লঞ্চ।

ঘন্টাখানেক একটানা ছুটে এসে বাঘনা জঙ্গল অফিসের জেটিতে কাজল দাঁড়ালো।

এখানকার জঙ্গলবাবু তারণ মান্দি জেটির ওপরেই দাঁড়িয়েছিলেন। রানা সাহেব ঝিঙেখালি অফিস থেকে ওয়ারলেসে জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর দুই ভাইপো যাচ্ছে জঙ্গল দেখতে। তারা বাঘনা এলাকা দিয়েই জঙ্গলের ভেতরে ঢুকবে।

তারণ মানন্ডির চিনে নিতে অসুবিধে হলো না রানাবাবুর দুই ভাইপোকে। তাদের দেখামাত্র তিনি বলে উঠালেন, নেমে এসো তোমরা। ভেবো না সুন্দরবনে তোমাদের একজনই কাকা আছেন, আমিও তোমাদের আর এক কাকা।

সবাই নেমে এলো। কাজলকে জেটির খুঁটির সঙ্গে বেঁধে নেমে এলো গোলাম রহমানও। তারণ মান্দি সবাইকে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন। খবর পেয়ে তিনি জলযোগের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। হালুয়া আর ডিমভাজা।

খাইয়েই তৃপ্ত হলেন না তারণ মান্দি। যাওয়ার সময় খানিকটা হালুয়া আর কয়েকটি নারকেল নাড়ু তিনি তুলে দিলেন দুই ভাইয়ের হাতে। ধীমান আর বিমানকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তোমাদের ছোটকাকে নিয়ে একদিন এখানে চলে আসবে। কেমন?

ধীমান বললে, নিশ্চয়ই আসবো।

তারণ মান্দি বললেন, আর একটা কথা জেনে রাখো। ঝাড়গ্রামের কাছে মানিক পাড়ায় আমার বাড়ি। তাহলে আমি হলাম গিয়ে তোমাদের ঝাড়গ্রামতুতো কাকা।

দুই ভাই না হেসে পারলো না।

তারণ মান্দি বললেন, হাসছো কেন?

আপনার কথা শুনে। বিমান বললে, আপনাকে আমরা ভালোকাকা বলে ডাকবো।

ভালোকাকা! তারণ মানন্ডির মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললেন, সেই ভালো। তোমরা আমাকে ভালোকাকা বলেই ডাকবে। ঠিক আছে, আর দেরি কোরো না। এগারোটা

বেজে গেছে। শীতের দিন, দেখতে দেখতেই ফুরিয়ে যাবে।

জেটিঘাটের কাছাকাছি এসে গোলাম রহমানকে একান্তে ডেকে কিছু বললেন মান্দি। কি বললেন বোঝা গেল না। গোলাম রহমানও কোনো কথা বললে না। মান্দি সাহেবের কথা শুনলো এই পর্যন্ত।

আবার যে যার মতো স্পীডবোটে উঠে বসলো। গোলাম রহমান মেরুদণ্ড সোজা করে বসে ইঞ্জিনে স্টার্ট দিলে। গুমরে উঠলো ইঞ্জিন। এক ঝাঁক বক বসেছিল গাছের ওপরে। ইঞ্জিনের শব্দে বকগুলো উড়ে গেল। তাদের সঙ্গে কিছু পাখিও।

এখানে নানা জাতের পাখি আছে। বিদেশের পাখিরাও শীতের মরশুমে এই সুন্দরবনে



আসে। এমন কি সুদূর সাইবেরিয়ার পাখিরাও হাজার হাজার মাইল আকাশ সাঁতরে চলে আসে সুন্দরবনে।

সুন্দরবনের গাছপালার পরিচয় বিশুর ভালোভাবেই জানা। ও এখানকার ছেলে। এই জল-জঙ্গলের দেশের।

ধীমান, বিমান এক-একটা গাছ দেখিয়ে জানতে চাইছে, এটা কি গাছ, ওটা কি গাছ। বিশু গাছের নাম বলে দিচ্ছে। কেওড়া, গরান, গর্জন, ওড়া, পিটুলি, পশুর, ধুন্দুল ছাড়া আরো কত নামের গাছ। আর সুন্দরী গাছ তো আছেই। সবচেয়ে সুন্দর দেখতে কাকড়া গাছগুলোর পাতা। হেতাল গাছও দেখতে চমৎকার। আর এই হেতাল ঝোপেই রাজা বাঘেরা থাকতে ভালোবাসে।

রায়মঙ্গলের বুকে জলের ওপর ভাসতে দেখা যাচ্ছে জলপিপিদের। ত্রিভুজ সৃষ্টি করে জলপিপিরা নদীর জলে ভাসছে। স্পীডবোট কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে পানকৌড়ি।

সাদা বক ঝাঁকে ঝাঁকে বসে আছে নদীর ধারের গাছের ডালে ডালে। আবার নদীর ধারের পলির ওপরেও লম্বা-লম্বা পায়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে খাদ্যের সন্ধানে। ছোট ছোট মাছ খেতে ওরা ভালোবাসে। পলির ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে ছোট ছোট লাল কাঁকড়া, মেনি মাছ। বকেরা ধরে ধরে খাচ্ছে। ধীমান আর বিমান অবাক চোখে দেখছে চারিদিকের দৃশ্যপট।

এবারে রায়মঙ্গল নয়, গভীর জঙ্গলের মধ্যে বিদ্যে নদী ধরে চলেছে স্পীডবোট কাজল। মাকড়সার জালের মতো সুন্দরবনকে জড়িয়ে রেখেছে নদী, খাল, খাঁড়ি। বিদ্যে নদীর দু'ধারে কশাড় জঙ্গল। কোথাও কোথাও জঙ্গল এত গভীর যে, সূর্যের আলো পড়ে না মাটিতে।

স্পীডবোটের গতি এখন কিছুটা মন্থর। দুই ভাই অবাক চোখে দেখছে গভীর বনভূমি। হঠাৎ চোখে পড়লো বিচিত্র এক দৃশ্য। দলে দলে বানর বসে আছে, গাছে, আর নিচে অজস্র হরিণ। বানরের দল কচি কচি ডাল ভেঙে নিচে ফেলে দিচ্ছে, হরিণেরা সেই ডালের পাতা আনন্দ করে খাচ্ছে।

স্পীডবোটের শব্দে হরিণেরা একটু ভীত হলো। কিন্তু ছুটে পালালো না। ওরা বনের পশু হলেও, বুঝতে পারে কে ওদের শত্রু, কে মিত্র।

বটুক বললে, বনবিভাগের লঞ্চ কিংবা স্পীডবোট দেখলে ওরা বুঝতে পারে। ওরা জানে আমাদের রাইফেলের গুলি ওদের বুকে বিঁধবে না।

নদী যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানে আরো এক সুন্দর দৃশ্য অপেক্ষা করছিল দুই ভাই-এর জন্য। ধীমান আর বিমান দেখলো পাড়ে খানিকটা জায়গা ফাঁকা মাঠের মতো। সামান্য ঝোপঝাড় ছাড়া কোনো গাছপালা নেই। ওখানে বন এলাকা পর্যবেক্ষণ করার জন্য বেশ উঁচু একটা টাওয়ার

আছে। নদীর ধার থেকে একটা পথ চলে গেছে টাওয়ারের দিকে। পথের দু'দিক গরানখুঁটি আর কাঁতটার দিয়ে মজবুত করে ঘেরা, ওপরেও তারের জাল। যাতে টাওয়ারে ওঠার পথে কোনো বিপদ না হয়।

ধীমান আর বিমান জিদ ধরলো টাওয়ারে উঠবে। গোলাম রহমান স্পীডবোট দাঁড় করালো। হর্ন দিতে লাগালো বার বার। মিনিট দশেক বাদে দেখা গেল দু'জন সাস্ত্রী এদিকে আসছে। তারা এখন ডিউটিতে।

এরা চামটা অফিসের লোক। বনরক্ষী এই টাওয়ারে এখন ডিউটি। সকালে এই দু'জন সাস্ত্রীকে এখানে নামিয়ে দিয়ে বাকিরা স্পীডবোট নিয়ে চলে গেছে নেতি ধোপানির বাদাবনের দিকে। ফেরার পথে এদের তুলে নিয়ে যাবে।

বেলা একটা বাজতে চললো। এবারে খাওয়া-দাওয়ার পালা চুকিয়ে নিতে হবে। কিন্তু খাওয়া-দাওয়া হবে কোথায়? স্পীডবোটে না টাওয়ারে?

কাঠের টাওয়ার। বেশ উঁচু। ধীমান, বিমানের ইচ্ছে টাওয়ারে উঠে খাওয়া-দাওয়া করে। কিন্তু টাওয়ারে একসঙ্গে এত মানুষের ওঠা নিষেধ। অগত্যা বোটেরই খাওয়া-দাওয়ার পালা সারতে হলো।

খাওয়ার আয়োজন বেশ জবর। খাঁটি ঘিয়ে ভাজা পরোটা, আলুর দম, কষা মাংস তো আছেই, এর ওপরেও আছে ভালোকাকা অর্থাৎ তারণ মানডির দেওয়া হালুয়া আর নারকেল নাড়ু। ভজগোবিন্দ শিশিভর্তি আচারও এনেছে। যা কিছু খাবার ভজগোবিন্দ নিজের হাতেই বানিয়েছে। খাওয়ার ব্যবস্থা রানা সাহেব তাকেই করতে বলেছিলেন।

বিশু সকলের জন্যে খাবার দিয়ে বাকি খাবার পাত্রে রেখে দিলে। প্রয়োজন মতো যে যার মতো চামচ দিয়ে তুলে নেবে।

হঠাৎ বিমান বলে বসলো, আমার সাঁতার কাটতে ইচ্ছে করছে।

ও ইচ্ছেটা মনের মধ্যে থাক। বিশু বললে, এখানকার নদীতে কি থাকে জানো?

ভজগোবিন্দ বললে, যা আছে তা আছে। নাম করার কি দরকার! এখন সুবন্ধেতে আরম্ভ করো। ক্ষিধেয় আমার পেট চুঁইচুঁই করছে।

বটুক বললে, কেন সকালে কিছু খাওনি? নিজের হাতে খানা বানালো? তেওয়ারি, আর একটু চেখে দ্যাখোনি? তুমি তো পেটটা নিয়েই আছো।

ভোজন পর্ব আরম্ভ হলো। খেতে খেতে বিশু বললে, সাস্ত্রী রহমান দাদা, নেতি ধোপানির দিকটা পাক দিয়ে ফিরলে কেমন হয়?

ভালোইতো হয়। গোলাম রহমান বললে, কিন্তু আকাশের ভাব দেখেছো? তাছাড়া শীতটা

আজ কেমন কম।

ভজগোবিন্দ বললে, আরে এখন তো শীতকাল। পোষ মাসে আকাশে অমন মেঘ-মেঘ-ভাব এক-এক দিন হয়। অনেক সময় ছিটেফোঁটা বৃষ্টিও পড়ে। এ তো বোশেখে মাস নয়, যে মেঘ দেখলেই ঝড়ের ভাবনা ভাববে।

বটুক বললে, এ-যে দেখছি ভূতের মুখে রাম নাম। রহমান ভাই-এর মনেও তাহলে ভয় আছে।

রহমান সে কথায় কানই দিলে না যেন। বললে, সাহেবের ভাইপো দুটি বেড়াতে এসেছে, তাদের নিয়ে ঘুরে বেড়ানো বনের রাজ্য, এতে তো আমারই সব চেয়ে বেশি আনন্দ হওয়ার কথা। দেখি কি হয়।

খাওয়া-দাওয়ার পালা চুকলো নানা কথা ও গল্পের মধ্যে। তারপর ধীমান আর বিমানকে নিয়ে টাওয়ারের ওপরে উঠলো বিশু। এখানকার দুই সান্দ্রীর সঙ্গে গল্প করতে বসলো ভজগোবিন্দ আর বটুক। কোনো কথায় বা গল্পে মন নেই গোলাম রহমানের। সে বারবার আকাশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের দিকে তাকাচ্ছে। যেখানে ধূসর রঙের মেঘ ছোট একটি পাহাড়ের রূপ নিয়েছে।

চব্বিশ বছর এই জল-জঙ্গলের দেশে বনদপ্তরের স্পীডবোট চালাচ্ছে রহমান। বাদাবন এলাকার নদী-নালায় নাড়িনক্ষত্র তার জানা।

রহমান জানে কোন নদীতে কোথায় ডুবো চর আছে, জানে কোথায় চোরা ঘূর্ণি আছে, তবু মাঝে মাঝে তার ভুল হয়ে যায়। কত সময় চরম বিপদের মুখে পড়তে হয়েছে। সাহসের সঙ্গে বিপদের মোকাবিলাও সে করেছে।

এই তো গত বছর, বর্ষার সময়—বাদা-বনের দেশের নদী-নালা যখন অথৈ জলে টইটশুর, জঙ্গলের ভিতরে টইল দিচ্ছিল স্পীডবোট নিয়ে। বোটে ছিলেন রানা সাহেব আর তিনজন সান্দ্রী। গিয়েছিল বিপদসঙ্কুল চামটা এলাকায়। জোয়ারের সময় খাঁড়ি দিয়ে ঢুকেছিল জঙ্গলের গভীরে। মাকড়সার জালের মতো অজস্র খাল, খাঁড়ি, নালি জঙ্গলের গভীরে। ফেরার পথে দীর্ঘ ভুল হয়ে গিয়েছিল। পৌঁছে গিয়েছিল কালিন্দীর পারে বাংলাদেশের সীমানায়। শেষ মুহূর্তে ধুসর মেঘে পেরে স্পীডবোটের মুখ ঘুরিয়ে দূরন্ত গতিতে বিপদসীমার বাইরে, চলে এসেছিল। তখন ছিল রাত, টিপটিপ করে বৃষ্টিও হচ্ছিল।

রহমানকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে ভজগোবিন্দ জিজ্ঞাসা করলে, কি ভাবছো রহমান ভাই?

রহমান কোনো কথা না বলে স্পীডবোটের হর্ন বাজাতে লাগলো। আর এখানে অপেক্ষা করা ঠিক নয়। এখনি বোট ছাড়া দরকার। এই সময় তার মনে পড়লো রানা সাহেবের কথা, যেন

সন্ধ্যের আগে সে ঝিঙেখালি ফিরে আসে।

টাওয়ারের ওপর থেকে জঙ্গলের রূপ দেখে ফিরে এলো ধীমানেরা। ওরা বোটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রহমান মেরুদণ্ড সোজা করে বসে ইঞ্জিনে স্টার্ট দিল। একবার হাতের ঘড়িতে সময়ও দেখে নিলে রহমান। আড়াইটে বাজে।

এবারে আর নদীপথে নয়, একটা খালের মধ্যে ঢুকে পড়লো রহমান। খালটা খুব সংকীর্ণ নয়। এই খাল দিয়ে আড়াআড়ি পথে যাবে হেড়োভাঙা নদীতে।

তীর গতিতে ছুটছে কাজল। ইঞ্জিন গুমরে গুমরে উঠছে। এখানে খালের দু'ধারে গভীর অরণ্য। দেখা যাচ্ছে হরিণ, বানর। নানা জাতের পাখ পাখালিও চোখে পড়ছে।

ভজগোবিন্দ রাইফেল বুকের ওপর নিয়ে শুয়ে পড়লো। বটুক কিন্তু স্পীডবোটের পিছনেই বসে আছে। সাস্ত্রীরা যা কাজ, শত্রু মুঠোয় ধরে রেখেছে রাইফেল।

বিমান এক সময় ভজগোবিন্দর রাইফেলটা হাতে নিতে গেল। ভজগোবিন্দ বললে, উঁহ হবে না খোকাবাবু।

বিমান বললে, আমাকে রাইফেল চালানো শিখিয়ে দেবেন তেওয়ারি কাকা?

ভজগোবিন্দ বললে, বড়ো হও, শিখবে।

হঠাৎ সবাই সচকিত হলো বাঘের ভয়ংকর গর্জনে। দূরে নয়, গর্জন ভেসে আসছে খুব কাছ থেকে।

ভজগোবিন্দ উঠে বসলো। শত্রু মুঠোয় ধরলো রাইফেল। স্পীডবোটের গতি এখন খুবই মস্থর। ইঞ্জিনের তেমন আওয়াজ নেই।

বাঘের গর্জন শুধু নয়, একটা গোঙানির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

স্পীডবোট কাজল খালের মাঝখান দিয়ে আস্তে আস্তে চলেছে। থেকে থেকে শোনা যাচ্ছে বাঘের গর্জন।

ধীমান আর বিমান উঠে দাঁড়াতে গেল। রহমান বলে উঠলো, যেমন বসে আছে তেমন বসে থাকো। কেউ নড়াচড়া করবে না।

খাল যেখানে বাঁক নিয়েছে, সেখানে দেখা গেল ভয়ংকর এক রোমহর্ষক দৃশ্য। হেতাল ঝোপ তোলপাড় করছে রাজা বাঘ আর বুনো শূয়ার। বুনো শূয়ারের মুখে ছুঁচলো দুটি বড় বড় দাঁত। এই জাতীয় বুনো শূয়ারকে এই এলাকার লোক দাঁতাল বলে। সুন্দরবনের রাজা বাঘের চেয়ে এরা কম ভয়ংকর নয়। বাঘের হাত থেকে যদি বা নিস্কৃতি পাওয়া যায়, কিন্তু দাঁতাল যদি ক্ষেপে গিয়ে তেড়ে আসে তাহলে রক্ষা নেই। নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও বুনো শূয়ার সমানে লড়ে যাবে।

হেতাল ঝোপ থেকে বেরিয়ে এলো বাঘ আর দাঁতাল। বাঘের পেট ফুটো করে দিয়েছে দাঁতাল। দাঁতালের সাদা দাঁত দুটি রক্তে লাল। শুয়োরেরও সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত। বাঘ খানিক পিছু হটে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ছে দাঁতালের ওপর, দাঁতালও তেমনি সজোরে গোঁত্তা মারছে বাঘকে।

ধীমান রীতিমতো ভয় পেয়ে গেছে এই ভয়ংকর দৃশ্য দেখে। আর দেখতে চাইছে না সে। বারবার চোখ বন্ধ করছে।

বাঘ আর শুয়োর খালের কিনারায় চলে এসেছে লড়াই করতে করতে। রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত হয়েও ওরা সমানে লড়ে যাচ্ছে। বাঘ যে কামড় বসাবে দাঁতালের গায়ে সে সুযোগেই পাচ্ছে না।

বাঘ পিছু হটে নরম পলির ওপর এসে পড়লো। তার পিছনের পা দুটি নরম পলির মধ্যে। পা টেনে তুলতে পারছে না। দাঁতালও নেমে এলো পলির ওপর। বাঘ এই সুযোগে সামনের দুটো থাবা তুলে দিল দাঁতালের ওপর। পলিতে ঢুকে গেল দাঁতালের চারটে পা। বাঘ ভয়ংকর গর্জন করে দাঁতালের ঘাড়ের কাছে কামড় বসালো।

এই মুহূর্তে আরো দৃশ্য—খালের ধারের গাছের ওপর দলে দলে জড়ো হয়েছে বানর, তারা উপভোগ করছে এই দৃশ্য।

স্পীডবোটের ইঞ্জিন চালু আছে। ভজগোবিন্দ আর বটুক রাইফেল বাগিয়ে ধরে আছে। আহত বাঘ আর আহত দাঁতাল—ওরা এখন প্রচণ্ড ক্ষেপে আছে। যে কোনো মুহূর্তে বাঘ জলে এসে পড়তে পারে।

নরম পলির ওপর পড়ে গেল বাঘ। দাঁতালের চোখে-মুখে কাদা। হয়তো ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছে না। তবু সে বাঘটাকে মরিয়া হয়ে গোঁত্তা মারতে লাগলো।

বাঘ নরম পলির ওপর শুয়ে। শুয়োরকে বাগে পেয়ে সামনের দুই থাবা দিয়ে জড়িয়ে ধরলো। শুয়োরও ছাড়বে না। সে তার ছুঁচলো দাঁত দুটো বসিয়ে দিয়েছে বাঘের তলপেটে।

পলিকাদা লাল হয়ে গেছে। পলির ওপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে বাঘ দাঁতালকে শিঁয়ে পড়ে গেল জলে।

জলে পড়ে বাঘ আর দাঁতাল ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। আর এখানে অপেক্ষা করা ঠিক নয়, স্পীডবোট আবার চালাতে আরম্ভ করলো রহমান। বারকয়েক হর্ন বাজালো।

দেখা গেল জল থেকে আবার ডাঙায় উঠছে আহত বাঘটা, কিন্তু দাঁতালকে আর দেখা গেল না।

আবার তীব্র গতি পেল কাজল। জল কেটে কেটে ছুটছে।

সূর্য এখন পশ্চিমে। শীতের দিন, দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যাবে।

রহমানের দৃষ্টি পশ্চিম আকাশের দিকে। ধূসর রঙের মেঘ আরো ছড়িয়ে পড়েছে। যদিও পৌষ মাস, তবু কেমন গুমোট ভাব। শীতের উত্তরে হাওয়াও নেই।

পৌষ মাস বড় বিচিত্র মাস। এই মাসে ছয় ঋতুর প্রকাশ ঘটে। এবারে এখনো পর্যন্ত বৃষ্টি হয়নি। আকাশে মেঘের যে চেহারা তাতে মনে হচ্ছে বৃষ্টি হতে পারে। বৃষ্টি হয়, সে একরকম। কিন্তু যদি ঝড় ওঠে।

ভয় কি তা জানে না রহমান। কিন্তু আজ যেন ভয়ের ভূত ওর মনে চেপে বসেছে। এমন সাধারণত হয় না।

এখন বার বার মনে হচ্ছে তার, রানা সাহেবের কথা। তিনি সন্ধ্যার মধ্যে ফিরতে বলেছেন।



কিন্তু তা একরকম অসম্ভব। এখন চারটে বাজে। পাঁচটার আগেই সূর্যাস্ত। যদি ছ'টার মধ্যে ফিরতে পারে তাও ভালো। মনে মনে হিসেব করে দেখলো তাও সম্ভব নয়। আসার সময়ে আসতে হয়েছে শ্রোতের বিপরীতে, আর ফিরতেও হচ্ছে শ্রোতের বিপরীতে। আসার সময় ছিল জোয়ার আর এখন ভাঁটা। শ্রোতের বিপরীতে না হলে যাহোক করে হয়তো সন্ধ্যা ছ'টার মধ্যে ফিরতে পারতো।

যতটা গতিবেগ বাড়ানো সম্ভব, বাড়িয়েছে রহমান। স্পীডবোট কাজলের সামনের দিকটা কেমন উঁচু হয়ে আছে। ফোয়ারার মতো জল ছিটকে উঠছে।

এখন খাল নয়, বিদ্যে নদীর মাঝ বরাবর ছুটছে কাজল। ধীমান আর বিমানের মনের মধ্যে আনন্দ শিহরণ। তাদের মনে হচ্ছে, যেন এক রোমাঞ্চকর অভিযান শেষ করে ঘরে ফিরছে।

এখন কারো মুখে কোনো কথা নেই। রহমান এবারে রায়মঙ্গল দিয়ে ফিরবে না। ফিরবে কালিন্দী দিয়ে। যদিও ঝড় উঠলে কালিন্দীও দামাল হয়ে ওঠে, কিন্তু রায়মঙ্গলের মতো নয়। হয়তো দু'দশ মিনিট সময় বেশি লাগবে, তবু কালিন্দী দিয়েই ফিরবে ঠিক করেছে।

মেঘের আড়ালে সূর্য ডুবছে। যদিও মেঘ ঘন ধূসর-কালো তবু পশ্চিম আকাশ কিছুটা রঙিন।

পাখিরা নীড়ে ফিরছে। হয়তো একটু আগেভাগেই। তবে নদীতীরের গাছের ডালে কোথাও কোথাও সাদা বকের দল বসে আছে তপস্বীর মতো।

স্পীডবোট কাজল একটানা ছুটছে জল কেটে কেটে। বার বার ঘড়িতে সময় দেখছে রহমান। আর পিছন ফিরে বার বার মেঘের দিকে তাকাচ্ছে।

মেঘ এখন আরো জমাট বেঁধেছে। মনে হচ্ছে ঝড়-বৃষ্টি হবে। ভাবছে আর যদি আধঘন্টা সময় পায় তাহলে কালিন্দীর বন এলাকা পেরিয়ে যেতে পারবে। বন এলাকা পেরোতে পারলে আর তেমন চিন্তা নেই।

রহমান এবারে স্পীডবোটের গতি আরো বাড়িয়ে দিলে। জানে এটা ঠিক নয়, তবুও। একবার চিৎকার করে বললেও, তোমরা যে যার সামলে বোসো। কেউ একটু এদিক-ওদিক করবে না।

সূর্য ডুবছে মেঘের আড়ালে। সূর্য ডুবলেও নদীর বুকে অন্ধকার তেমন ঘন হয়ে নামে না।

কালিন্দীর বুকে কোনো নৌকা বা কোনো কিছু চোখে পড়ছে না। জঙ্গল এলাকায় নৌকার যাওয়া-আসা এমনতেই কম। যারা মাছ ধরে আর মধু সংগ্রহ করে, তাদের নৌকাই জঙ্গল এলাকায় যায়। মাছ ধরার কোনো মরশুম নেই, তবে মধু সংগ্রহের মরশুম আছে। মধু সংগ্রহের সময় এখনো আসেনি।

স্পীডবোটের ইঞ্জিন দিয়ে ধোঁয়া উড়ছে। গরম হয়ে গেছে ইঞ্জিন। এক নাগাড়ে শ্রোতের বিপরীতে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে রহমান।

ধীমানের মনের মধ্যে ভয়। বটুক আর ভজগোবিন্দ মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। বিশু চুপচাপ। আর বিমান এর মধ্যে হঠাৎ গাইতে আরম্ভ করলো, খর বায়ু বয় বেগে, চারিদিক ছায় মেঘে—

যদিও বিমানের সুরে সুর মেলালো ধীমান, কিন্তু তার বুক তখন ভয়ে দুরু দুরু করছে। গান গাইতে গাইতে তার মনে কিছুটা সাহস ফিরে এলো।

জঙ্গল এলাকা প্রায় পেরিয়ে এসেছে রহমান। আর দশ-বারো মিনিট সময় পেলে নিরাপদ এলাকায় পৌঁছে যাবে। সন্ধ্যা হয়েছে। এদিকে প্রায় সারা আকাশ ছেয়ে গেছে মেঘে। চারিদিকের পরিবেশ থমথমে।

সামনেই চর আছে। ডুবো চরা স্পীডবোটের গতি কিছুটা মস্থর করলো। জোয়ারে এই চর জলের নিচে তলিয়ে যায়। ভাঁটায় কিছুটা জেগে ওঠে। চরের বালিতে যদি আটকে যায় স্পীডবোট, তাহলে বিপদ।

চর আছে নদীর মাঝ বরাবর। তাই তীর ঘেঁষে চলছে রহমান। হঠাৎ ইঞ্জিনের শব্দ ছাপিয়ে একটা শব্দ কানে এলো। ঝড়ের শব্দ। রহমান রীতিমতো শঙ্কিত। কালিন্দীর এই চর এলাকা দারুণ বিপদজনক। চর থাকার দরুণ ঝড়ের সময় নদীতে এলোমেলো ঢেউ ওঠে। এখানে কয়েক জায়গায় চোরা ঘূর্ণিও আছে।

এবারে সার্চলাইট জ্বাললো রহমান। একটানা হর্ন বাজাতে আরম্ভ করলো। ঝড়ের গর্জন আরো স্পষ্ট।

দুরন্ত গতিতে ছুটে এলো ঝড়। মুহূর্তে ক্ষেপে উঠলো কালিন্দী। চিৎকার করে উঠলো রহমান, যে যেমন আছো, বোট আঁকড়ে ধরে বসে থাকো। ভয় নেই, মনে জোর রাখো।

স্পীডবোট টালমাটাল করছে। জল উপচে উঠছে বোটে। পরনের পোশাক আশাক ভিজে গেল।

সেই ভয়ঙ্কর ঢেউ-এর মোকাবিলা করে কাজল এগিয়ে চলেছে। কিন্তু কাজলের অবস্থা কাগজের নৌকার মতো। মনে হয় এই বুঝি ডুবে গেল।

সোজাসুজি নয়, একটু কোনাকুনি স্পীডবোটকে নিয়ে চলেছে রহমান। আর থেকে থেকে চিৎকার করে বলছে, ভয় নেই, আমরা ঠিক পৌঁছে যাবো।

চরের ডান দিক দিয়ে চলেছে রহমান। কালিন্দী এখানে উন্মাদ। মুখে যাই বলুক, রহমান বেজায় ভয় পেয়ে গেছে। তারও মনের গভীরে চিন্তা, শেষটা অঘটন না ঘটে।

কয়েকটি রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত। কোনাকুনি ভাবে চলতে চলতে স্পীডবোটটা পাড়ের দিকে এলো।

ওখানে ঢেউ আরো বেশি। কিন্তু রহমান জানে এখানে কড়েখালি নামে একটি খাল আছে।

অবশেষে দুরন্ত ঢেউ-এর মোকাবিলা করে খালের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে স্পীডবোট। এতক্ষণে মনের মধ্যে একটু স্বস্তি। খাল বরাবর কিছুটা গেলেই কালিন্দী ফরেস্ট অফিস।

জঙ্গলের শেষ এইখানেই। এখানে খালের এক তীরে বাদাবন, অন্য তীরে গ্রাম। এখন ভাঁটা। খালে তেমন জল নেই। তবে ছোট স্পীডবোট কোনো রকমে চলতে পারে।

একবার মনে হলো রহমানের, ডান পাড়ে সবাইকে নামিয়ে দেয়। কিন্তু চিন্তা করে দেখলো, সেটা ঠিক নয়। এখানে জঙ্গলে যেমন ভয়, রাতে গ্রামের দিকে ঠিক তেমন না হলেও ভয় আছে। এই এলাকায় অগভীর খাল পেরিয়ে বনের বাঘ মাঝে মাঝে গ্রামে ঢোকে। সন্ধ্যার পর তাই এলাকার মানুষ খুব দরকার না হলে ঘরের বার হতে চায় না।

ঝড়ের তাণ্ডব সমানে চলেছে। মনে হয় হাজার হাজার দৈত্য লড়াই করছে। আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে গাছ ভেঙে পড়ার। চোখের সামনেই গাছপালার ডাল ভেঙে পড়ছে। একটি গাছ যদি মাথার এপর ভেঙে পড়ে তাহলে আর রক্ষা নেই।

খালের মধ্যে দিয়ে একটানা হর্ন বাজিয়ে স্পীডবোট নিয়ে চলেছে রহমান। তবে খুবই মস্থর গতিতে। পায়ে পায়ে হেঁটে চলার মতো গতি।

ওই দ্যাখো রহমান কাকা, বিমান বলে উঠলো, হরিণের মতো কি যেন একবার ডুবছে, একবার ভাসছে।

সত্যি একটা হরিণশিশু, খালের জলে ডুবছে আর ভাসছে।

বটুক ওঝা হাত বাড়িয়ে তুলে নিলে শিশু হরিণশিশুটিকে কেমন নিখর হয়ে গেছে।

বিশু গামছা দিয়ে হরিণশিশুকে পরিষ্কার করে মুছিয়ে দিলে। জলে ভিজে ঠকঠক করে কাঁপছে শিশু-হরিণ। বিশু তাকে তুলে দিলে বিমানের কোলে। বিমান কোলে নিয়ে বসলো শিশু-হরিণটাকে। হরিণটার বুক তখন ধুকধুক করছে।

ঝড়ের সঙ্গে এবারে মুমুলধারায় বৃষ্টি নামলো। রহমান বলে উঠলো, খোদা আর কি খেল দেখাবে।

বিমান বললে, এই তো মজা, রহমান কাকা।

কি বাজে বকছিস, ধীমান ধমকে উঠলো; চুপ কর।

বিমান রাগ করলো না ধীমানের কথায়। বললে, আচ্ছা চুপ করলে কি ঝড়-বৃষ্টি থেমে যাবে।

কালিন্দী জঙ্গল--অফিস আর খুব দূরে নয়। যে গতিতে চলছে, তাতে মিনিট দশেক লাগবে পৌঁছতে।

রহমানের মনে এখন আর তেমন দুশ্চিন্তা নেই। ও ধরেই নিয়েছে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে গেছে।

সামনেই আবার বাধা। একটা বেশ বড় কেওড়া গাছ খালের ওপর আড়া-আড়ি ভাবে উপড়ে পড়ে আছে। এমন ভাবে ডালপালা নিয়ে পড়েছে, স্পীডবোটের যাওয়ার কোনো উপায় নেই।

অগত্যা স্পীড বোট থামাতে হলো। ঝড় আর বৃষ্টি তখনো চলেছে। তবে ঝড়ের দাপট কিছুটা কম।

ইঞ্জিনের স্টার্ট এখনো বন্ধ করেনি রহমান। কালিন্দী অফিস দূরে নয়, কাছেই। পাড় দিয়ে পায়ে হেঁটে গেলে দশ-বারো মিনিটের মধ্যেই পৌঁছানো যায়।

বার বার হর্ন বাজালো রহমান। নিশ্চয়ই হর্নের শব্দ শুনতে পাওয়া যাবে কালিন্দী বন অফিস থেকে। আওয়াজ শুনলেই বুঝতে পারবে বনবিভাগের স্পীডবোট আটকে পড়েছে এখানে। তারপর সার্চলাইট তো দূর থেকেই চোখে পড়বে। বন-অফিস ছাড়াও মাইল খানেক দূরে কালিন্দীর ধারে রয়েছে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ছাউনি। হর্নের আওয়াজ শুনে সেখান থেকেও নিশ্চয়ই রক্ষী বাহিনীর লোকজন ছুটে আসবে।

রাত এখন সাড়ে আটটা বাজতে চললো। ঝিঙেখালি জঙ্গল অফিস থেকে নিশ্চয়ই এতক্ষণে বার্তা পৌঁছে গেছে বিভিন্ন জঙ্গল অফিসে। যে স্পীডবোট সন্ধ্যার মধ্যে ঝিঙেখালি অফিসে ফেরার কথা, সেই স্পীডবোট এখনো ফেরেনি। তারপর এই স্পীডবোটে রয়েছে রানা সাহেবের দুই ভাইপো।

রহমান আরো ভাবছে রানা সাহেব নিশ্চয়ই এই দুর্ঘটনার জন্যে দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়েছেন।

কিছু সময় বাদেই দেখা গেল, চারটি জোরালো আলো এগিয়ে আসছে জঙ্গলের পাড় বরাবর।

এতক্ষণে সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

একে পৌষ মাস, তারপর ঝড়-বৃষ্টিতে ভেজা, এতক্ষণে শীতের কথা মনেই হয়নি কারো। সবাই ছিল ভয় আর প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে—শীতের কোনো অনুভূতিই ছিল না। কিন্তু এবারে মালুম হলো শীতের কামড়।

কালিন্দী অফিসের সহকারী রেঞ্জার ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় নিজে এসেছেন তিনজন সশস্ত্র সাদ্রীকে নিয়ে। স্পীডবোট দেখেই চিনতে পারলেন। আর বনকর্মীদের সবাই তো তাঁর জানা-চেনা।

সেই জল-কাদার মধ্যে স্পীডবোটে উঠে এলেন ভোলানাথবাবু। বিমানের কোলে হরিণশিশুটাকে দেখে বলে উঠলেন, এটি কোথায় পেলেন?

কি ভাবে হরিণশিশুটিকে পেয়েছে তা জানালো বিমান। শুনে ভোলানাথবাবু বললেন, ওর ভাগ্য ভালো বেঁচে গেছে।

হরিণশিশুটা তখনো থরথর করে কাঁপছে। আর মাঝে মাঝে সুন্দর চোখ মেলে ফিরে চাইছে বিমানের মুখের দিকে।

ধীমান, বিমানের মুখের দিকে চেয়ে ভোলানাথবাবু খুব অবাক হয়ে বললেন, তোমাদের মধ্যে কে ধীমান আর কে বিমান?

বিমান বললে, আপনি আমাদের নাম জানলেন কি করে?

ভোলানাথবাবু বললেন, তোমাদের কথা এখন এখানকার সব অফিসই জেনে গেছে। রানাবাবুর জরুরি বার্তা পৌঁছে গেছে এখানকার সব বন অফিসে। যাক, আর দেরি নয়, এবারে উঠে এসো তোমরা। রানাবাবুকে খবরটা তো জানাতে হবে।

এদিকে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানেরা এসে গেছে। তারাও ঘটনার কথা শুনলো।

ভোলানাথবাবু ধন্যবাদ জানালেন জওয়ানদের। বললেন, আমি খুব খুশি হবো যদি আপনারা আমাদের অফিসে আসেন।

জওয়ানদের একজন বললে, ঠিক আছে রেঞ্জারবাবু। তবে আজ তো যেতে পারছি না। পরে একদিন আসবো। আমরা চলি স্যার। অফিসের সবাই ভাবছে। খবরটা আগে পৌঁছানো দরকার।

স্পীডবোট আপাতত এখানেই নোঙর করা রইলো। গাছ না কাটা পর্যন্ত বোট এখানেই থাকবে। এই জল-ঝড়ের মধ্যে গাছ কাটা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

জওয়ানেরা চলে গেল জল-ঝড়ের মধ্যে। এরাও খালের পাড় বরাবর ফিরছে কালিন্দী বন-অফিসে। সন্তুর্পণে চলতে হচ্ছে প্যাচ্যপ্যাচ জলকাদার ওপর দিয়ে।

গা ছমছম করছে ধীমানের। যদি এই সময় জঙ্গলের ভিতর থেকে বাঘ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

জোরালো টর্চের আলো চারদিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ফেলছে সান্ত্বিনী শেখ মুঠোয় রাইফেলও ধরা আছে।

গোলাম রহমান চলেছে সবার আগে ভাগে। মনে মনে সে ঠিক করেছে জঙ্গল অফিস থেকে দা-কুড়াল এনে আজ এখনই কেটে ফেলবে কেওড়া গাছটাকে। স্পীডবোট কাজলকে ওখানে রেখে তার স্বস্তি নেই।

কালিন্দী বন-অফিসে এখন উৎসবের আমেজ। রানাবাবুকে বার্তা পাঠিয়েছেন ভোলানাথবাবু। এছাড়া অন্যান্য বন-অফিসেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে স্পীডবোট কাজল আর যাত্রীদের নিরাপদে ফিরে আসার খবর।

একে শীত তায় এই রকম ঝড়-বৃষ্টি, ভোলানাথবাবু বলেছেন খিচুড়ি আর ডিম ভাজার ব্যবস্থা করতে। তার আগে অবশ্য চা, মুড়ি আর চানাচুর দিয়ে জলযোগটা বেশ ভালই সারা গেছে।

এখানে তো ধীমান আর বিমানের বয়সি কেউ নেই। ওরা ভিজে পোশাক ছেড়ে পরেছে লুঙ্গি আর বড় বড় জামা। আলোয়ান তো আছেই।

সবাই যখন একটা ঘরে বসে গল্প জমিয়েছে, গোলাম রহমান তখন একজন সাস্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে কেওড়া গাছ কাটতে গেছে। শুধু ভোলানাথবাবু নয়, সবাই তাকে এখন এই রান্ধিরে যেতে নিষেধ করেছিল, কিন্তু এমনই একগুঁয়ে, কারো কথা কানে নেয়নি। তার কথা হলো, সে এখানে বসে আরাম করবে, আর স্পীডবোট কাজল পড়ে থাকবে খালে সে হয় না।

রাত বারোটা। ঝড়ের দাপাদাপি আর নেই। তবে টিপটিপ বৃষ্টি হচ্ছে। আকাশের কোণের দিকে মেঘ ভেঙে গেছে। ভাঙা মেঘের ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্নার আভাস দেখা যাচ্ছে।

শীত পড়েছে হাড় কাঁপানো। ঝড় না থাকলেও মাঝে মাঝে হাওয়া দিচ্ছে।

এবারে খাওয়ার ব্যবস্থা হবে। রান্না হয়ে গেছে।

কাঠের বাংলোর প্রশস্ত বারান্দায় খাবার জায়গা করা হয়েছে। ঠিক হয়েছে সবাই আজ একসঙ্গে বসে খাবে।

সবাই খেতে বসবে। ঠিক সেই সময় জেটিঘাটে স্পীডবোট থামার আওয়াজ হলো। সবাই ভাবলো, গোলাম রহমান এলো। কিন্তু না। দেখা গেল রানাবাবু আসছেন। সঙ্গে একজন বনরক্ষী।

আরো দুটি পাত পাততে হবে ভোলানাথবাবু। রানাবাবু বললেন, খিচুড়ির গন্ধে গন্ধে নিজেই স্পীডবোট চালিয়ে চলে এলাম।

ভোলানাথবাবু খেতে বসেছিলেন, তাড়াতাড়ি উঠতে গেলেন। রানাবাবু বললেন, আরে কেন উঠছেন আপনি। বসুন। আমরাও বসে যাচ্ছি।

ধীমান আর বিমান বসেছে ভোলানাথবাবুর পাশে। রানাবাবু এগিয়ে এলেন। আদরের ভাইপো দুটির সামনে উঁবু হয়ে বসে বললেন, কি, কেমন অভিজ্ঞতা হলো বনরক্ষীদের। ছোটকা আমরা সুন্দরবন দেখতে যাবো, শখ মিটলো তো সুন্দরবন দেখাবো।

দুই ভাই তখন মুখ টিপে হাসছে।

রানাবাবু এবারে বারান্দায় এদিক থেকে ওদিক তাকালেন। বললেন, গোলাম রহমানকে

দেখছি না তো।

আবার স্পীডবোট থামার আওয়াজ এলো। নিশ্চয়ই গোলাম রহমান ফিরছে।

গোলাম রহমানই এলো। কিন্তু তাকে হঠাৎই চেনাই যায় না। সর্বাস্থে কাদা মাখা। এমন কি মুখেও।

কুড়াল কাঁধে এসে দাঁড়ালো গোলাম রহমান। রানাবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, সাহেব, আমার ছোট্ট বন্ধুদের ঠিক মতো জঙ্গল দেখাতে পারিনি, ইচ্ছে আছে আর একদিন নিয়ে যাবো।

রানাবাবু বললেন, বেশ তো, যাবে। তুমি যে ওদের ফিরিয়ে এনেছো, এইটাই আশ্চর্য। আমি তো ধরেই নিয়েছিলাম—

কথা শেষ করলেন না রানা সাহেব।

রাত শেষ হয়ে আসছে। এখন আর এতচুকু মেঘ নেই আকাশে। পরিষ্কার জ্যোৎস্নাধোয়া আকাশ।

পাহারারত সান্দ্রীরা ছাড়া সবাই ঘুমিয়ে আছে। মাঝে মাঝে এক-একটা রাত জাগা পাখি ডাকছে। ঝড়ে বোধহয় তাদের নীড় ভেঙে গেছে।

বিমানের ঘুম ভেঙে গেছে। সে চুপচাপ বিছানায় শুয়ে আছে।

একসময় কানে এলো হরিণের করুণ ডাক। হরিণের ডাক সে পালামৌ-এ শুনেছে। কিন্তু ও ডাক যেন একটু করুণ।

ধীমানকে ডাকলো বিমান। ধীমান গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল। ডাকার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমজড়িত কণ্ঠে বলে উঠলো, আমরা এখন কোথায় রে ভাই?

বিমান বললে, পাগলের মতো কি বলছিস। আমরা কালিন্দী ফরেস্ট অফিসে।

ধীমান দু'চোখ রগড়ে উঠে বসলো।

বিমান বললে, বাইরে যাবি ভাই?

ধীমান বললে, না। ছোটকা আছে না।

বাইরে তখনো হরিণ ডাকছে।

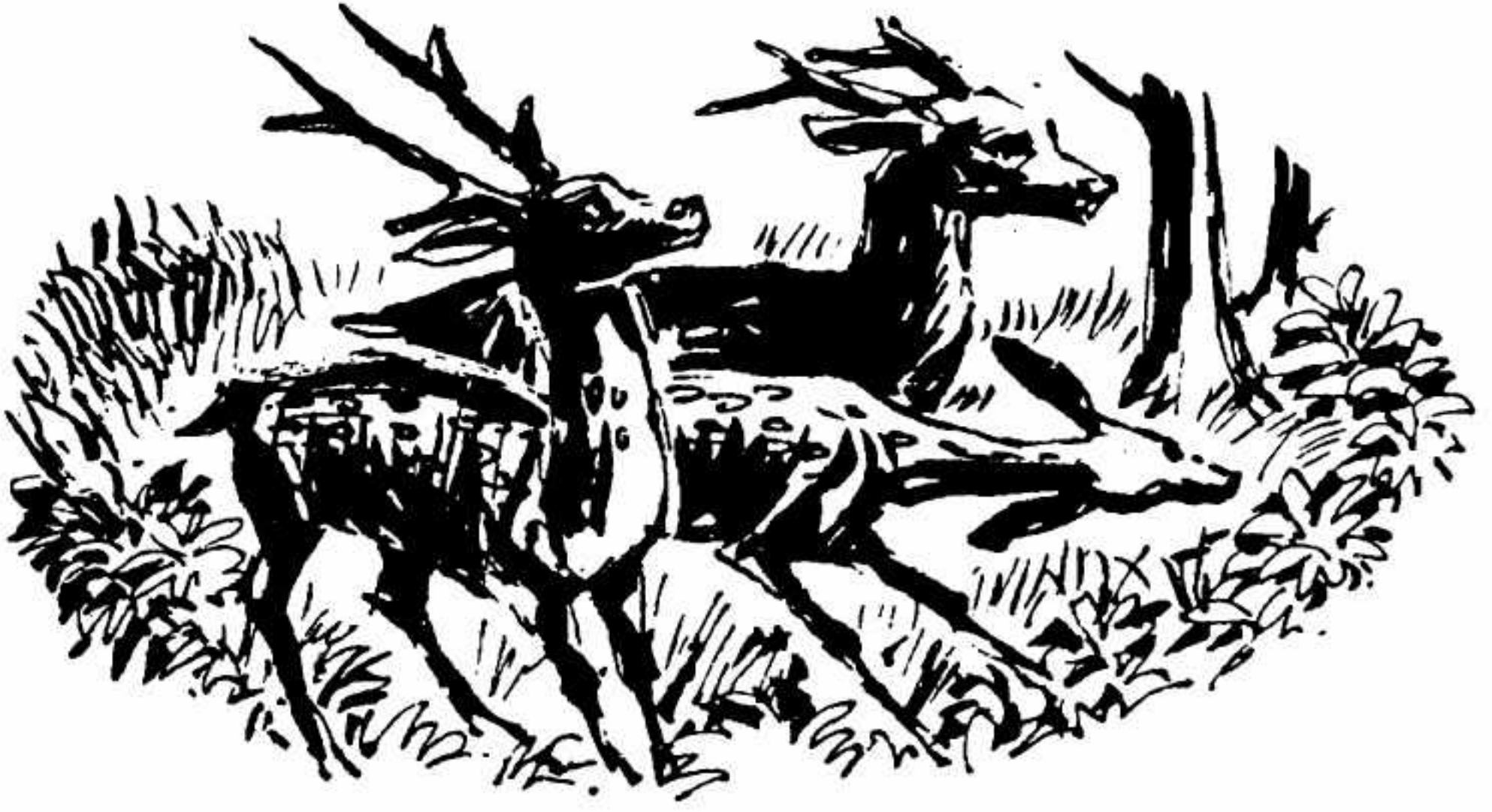
হরিণশিশুটা ঘুমিয়ে ছিল। সে-ও উঠে মিহিসুরে ডাকতে আরম্ভ করলো। বাইরে থেকেও সমানে আসছে হরিণের ডাক। হরিণশিশু ছটফট করতে আরম্ভ করলো।

রাত শেষ। খুব আকাশ লাল। হরিণ-শিশুকে নিয়ে বাইরে এলো ধীমান আর বিমান। দেখলো কাঁটাতারের বেড়ার ওধারে তিনটে হরিণ দাঁড়িয়ে আছে। মা-হরিণের চোখে জল।

দুই ভাই অবাক চোখে দেখছে তিনটে হরিণকে। আর হরিণশিশু বিমানের কোলের মধ্যে

ছটফট করছে।

হরিণশিশুটাকে ছেড়ে দে। ছোটকার কণ্ঠস্বর শুনে ফিরে তাকালো দুই ভাই। ভোলানাথবাবু



আর তাদের ছোটকা এদিকেই আসছেন।

ছোটকা।

হ্যারে বিমান, হরিণশিশুটাকে তোর ছেড়ে দিতে মন চাইছে না, তাই না। বলে বিমানের মাথায়, পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন বিভূতি রানা। বললেন, জানিস, কাল সন্ধ্যায় যখন ঝড় উঠলো, তখন তোদের জন্যে মনের মধ্যে কি ছটফটানি। এই রকম সময় আমার জীবনে কখনো আসেনি। যতক্ষণ না তোদের খবর পেয়েছি ততক্ষণ আমার মাথার ঠিক ছিল না। এখন ভেবে দ্যাখ তো এই শিশু-হরিণটার মায়ের মনের কি অবস্থা ওদেরও তো মন আছে আমাদের মতো।

হরিণশিশুকে আদর করে ছেড়ে দিলে বিমান। শিশুহরিণ ছুটে চলে গেল তার মাথার কাছে। আর দাঁড়ালো না হরিণেরা। ছুটে চলে গেল বনের দিকে।

ভোলানাথবাবু বললেন, জানো ছোট বন্ধুরা, এই সব বনচারীরা বড়ো ভালো। ওদের আলাদা একটা জগৎ আছে। সে জগৎ হলো বন। চলো, জেটিঘাটের দিকে যাই। ওখান থেকে সূর্য ওঠা দেখবে।

সূর্য উঠেছে কালিন্দীর ওপার থেকে।

কালিন্দীর ওপারে বাংলাদেশ। একই দেশ, এখন দুটি ভাগ। এপারে পশ্চিমবাংলা, ওপারে বাংলাদেশ।

দু দেশের মানুষ একই ভাষায় কথা বলে, একই ভাষায় গান গায়। এদেশের গঙ্গা, ও দেশের পর্দা দুইয়ের উৎস এক।

বিমান ভাবছিল, দেশটা যদি ভাগ না হতো, তাহলে কি ভালই না হতো।

অনুরূপ ভাবনা ধীমানের মনেও। ওরা শুনেছে দেশভাগের কথা। বইতে পড়েছে। তারপর কিভাবে বাংলাদেশের জন্ম হল তাও ওদের অজানা নয়। সবই এখন ইতিহাস হয়ে গেছে।

দুই কিশোর মন ব্যাথায় কাতর হলো। দুজনের মনে একই ভাবনা, দুটো দেশ যদি একই থাকতো। ছিল তো একই দেশ। তবু ভাগ হলো।

ভোলানাথবাবু লক্ষ্য করলেন, দুই ভাইয়ের ভাবান্তর। কাছে এসে জানতে চাইলেন, কিগো কি ভাবছে ছোট্ট বন্ধুরা।

ধীমান বুক চাপা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললে, আচ্ছা কাকু, আমরা কি ইচ্ছে করলে ওই ওপারের বাংলাদেশের মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতে পারি না।

ভোলানাথ বললেন, না। ওটাতো অন্য দেশ। ওই দেশেতো ইচ্ছে করলেই যাওয়া যাবে না। ওদেশে যেতে গেলে পাসপোর্ট চাই, ভিসা চাই।

বিমান বললে, ধরুন যদি এমনিতেই চলে যাই।

ভোলানাথ হাঁসলেন। বললেন, তা তো হয় না ছোট্ট বন্ধু – দেশেতো আইন আছে। তাই না! জানো, ওই ওপার বাংলায় আমার জন্ম। এখান থেকে বেশী দূরে নয় আমাদের সেই ছেড়ে আসা গ্রাম। জানো, সে ছোট্ট বেলার কথা মনে এলে কান্না পায়। আমার তখন ছ বছর বয়স, বাবা-মায়ের সঙ্গে ওই দেশ ছেড়ে চলে আসি। এখনও দুচোখ বন্ধ করলে আমাদের সেই বাড়ি, বাগান, পুকুরের ছবি মনের মধ্যে ভাসে। কতদিন আগের স্মৃতি ছবি, স্নান হয়নি।

ধীমান বললে, চলে আসার পর আর কখনো যাননি।

না। ভোলানাথ বললেন, মাঝে মাঝে মন চেয়েছে— কিন্তু যাইনি। তবে শুনেছি আমাদের সে বাড়ি ঘরের কোনো চিহ্নই আর নেই।

কথার শেষে বুক চাপা নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন ভোলানাথ।

সূর্য বেশ খানিকটা ওপরে উঠে এসেছে। রূপালি রোদুর এখন চারিদিকে, দুই ভাই এখন জেটি ঘাটের পাটাতনের ওপর বসে। ভোলানাথ চলে গেছেন। যাবার সময় বারবার বলে গেছেন, তোমরা যেন জলে টলে নেমো না। আর বেড়ার বাইরে যাবেনা। দেখছো তো চারিদিকে কাঁটাতারের বেড়া। শোনো, জলখাবার এলেই তোমাদের ডাক পড়বে।

দুই ভাই পাটাতনের ওপর চাপ বসে। দৃষ্টি তাদের কখনো ভাসমান নৌকার দিকে, কখনো

নদু পারের ওপর বসা সাদা বকের দিকে, তপস্বীর মতো বসে আছে বকেরা। দু-চারটে বক অবশ্য নিচে পলিকাদার ওপর নেমে ছোট ছোট লাল কাঁকড়া খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। বেশ লাগছে দেখতে।

হঠাৎ একটা শব্দ কানে এলো। সচকিত হলো দুই ভাই। ভয় পেয়ে বকের দল ডানা মেললো আকাশে।

শব্দটা কিসের?

ধীমান বললে, কাছেই সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ক্যাম্প আছে- হয়তো কোনো কিছু ঘটেছে সেখানে।

ধীমান বললে, তা হয়তো হবে। তাছাড়া এখানে গোলাম রহমানের ইচ্ছেটাই তো সব নয়। এখানে ছোট্কার ইচ্ছেটাই সব।

কথার মধ্যে বিশু এলো। বললে, চলো-জল খাবার হয়ে গেছে।

বিমান বললে, মেনুটা কি, জেনে এসেছেন।

বিশু বললে, এই জঙ্গলের দেশে তো সন্দেশ রসগোল্লা, কি চপ কাটলেট তো মিলবে না। তবে ব্যবস্থাতাটা খারাপ কিছু হয়নি। গরম গরম ফুলকো লুচি, আলুর দম আর নলেন পাটালি দিয়ে চিড়ের পায়েস।

জঙ্গল অফিসের বাইরে কয়েকটা চেয়ার আর দুটি বেঞ্চি পাতা। যে যার মত বসে পড়ল। শীতের মিষ্টি রদদুর ভালোই লাগছে।

রানাবাবু আর ভোলানাথবাবু পাশাপাশি বসে খোশ গল্প করছিল। আরো যারা, সবাই এই কালিন্দী ফরেস্ট অফিসেরই। এখানে সবাই যেন এক পরিবার।

কলাপাতায় করে জল খাবার পরিবেশন করছে এই অফিসেরই দুজন সান্ত্বী।

জলযোগের আসরে সবাই আছে, এক গোলাম রহমান ছাড়া।

তারই মধ্যে কিন্তু এক সময় ধীমান আর বিমানের পিছনে এসে দাঁড়ালো।

দুই কিশোর বন্ধুর মাঝখানে একটু ঝুঁকে চুপি স্বরে বললে, হয়তো কাল সন্ধ্যা দিন।

সত্যি বলছো? বিমান জিজ্ঞাসা করলো।

না কি মিথ্যে বলছি। ঠিক বললে, এই অফিস থেকেই আমরা যাবো। আজ আমরা সবাই এই অফিসের অতিথি। চাটুজ্যে সাহেবের ইচ্ছেতেই সব ব্যবস্থা হচ্ছে।

নয়তো রানা সাহেবের ঠিক ইচ্ছে ছিল না।

ধীমান আর বিমানের মন আনন্দে নেচে উঠলো। আজ রাতে জঙ্গলের রূপ তারা দেখবে। তাদের জীবনে হবে এক নতুন অভিজ্ঞতা।

বিমান জিঙ্গেস করলে, তুমি ঠিক জানো তো বিশুদা?

বিশু বললে, একেবারে পাকা খবরই জানাচ্ছি। শেষ বিকালেই আমাদের যাত্রা আরম্ভ হবে। জানো ভাই জঙ্গল আমাদের আর ভালো লাগে না।

দুই ভাই-এক মনে এখন একটাই চিন্তা। কতক্ষণে বিকাল হবে। কখন স্পীড বোট যাত্রা করবে।

কালিন্দী অফিসে আজ হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার। দুপুরেই তিন-তিনটি স্পীড বোট জেটি ঘাটে মোতায়ন হয়েছে।

শুভ গোবিন্দ তো সকাল থেকে রান্না নিয়ে ব্যস্ত। দুপুরের খাবার তো খাওয়া হয়েই গেছে। ডাল। ভাত, তরকারি, কুজো ভেটকির ঝাল আর তেল নেই। এখানে তো মিষ্টি টিষ্টি মেলে না, শেষ পাতে ছিল চাটনি। রাতের খাওয়া দাওয়া স্পীড বোটেই হবে। রান্না করা হয়ে গেছে। রান্না খাবারই যাবে স্পীড বোটে। খাঁটি গাওয়া ঘিয়ে ভাজা পরোটা, আলু-ছোলার তরকারি আর ভেটকি মাছের ঝাল। এ ছাড়া মিষ্টি থাকবে। সকালেই একজন রওনা হয়ে গেছে মোল্লাগাজির হাটে মিষ্টি আনার জন্য।

আজকের যা কিছু আয়োজন, শাস্ত্রী অফিসের ভোলানাথ বাবুর। কোথায় কি ভাবে জঙ্গল মহলে ঘোরা হবে, তা ঠিক করে রেখেছেন তিনি। তার কথা হলো, ঠিক ঠিক সুন্দরবন দেখতে হলে রাত্রেই দেখতে হবে। শুধু সুন্দরবন কেন, যে কোন জঙ্গল দেখার উপযুক্ত সময় রাত।

শীতের বেলা দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যায়। দুপুর বলো তো ব্যস। দিন শেষ।

এখন বেলা তিনটে বাজে। সাড়ে চারটেয় এখান থেকে রওনা হবার কথা।

স্পীড বোটে কাজলতো আছেই, আর আছে সাগর এবং সুন্দরী। কাজলের শ্যালক গোলাম রহমান, সাগর চালাবে মোহন্ত আর সুন্দরীর চালক লখিন্দর। তারা এখন যে যার স্পীড বোট দেখে বুঝে নিচ্ছে। সব ঠিক ঠাক আছে কি না।

যে ভাবে জঙ্গলে যাওয়ার ছক করেছেন ভোলানাথবাবু তাতে দ্রুত গতিতে বোট ছুটিয়েও রাতের মধ্যে শেষ করা দায় হয়ে উঠবে। হেরোভাঙা, নেতি ধোপানী, পেঘিয়ে প্রায় সমুদ্রের কাছাকাছি যাওয়ার পরিকল্পনা আছে।

জঙ্গল অফিসে লোকজনের কাছে এ নতুন কিছু নয়। তাদের তো হামেশাই ছুটতে হয়। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা— বারো মাস।

এখন তো শীতকাল। নদী, তা সে যে নদীই হোক-শান্তি, গ্রীষ্ম-বর্ষায় এসব নদীপথ পাগল হয়ে ওঠে। ঝড় তুফানে উথালি পাথালি ঢেউ-এর বাঁধাকে অতিক্রম করে যেতে হয় ভয়াল ভয়ঙ্কর জঙ্গলের গভীরে।

তবু জঙ্গল অভিযানে যেতে কিছুটা চিন্তা থেকেই যায়। যেখানে যেকোনো মুহূর্তে চরম বিপদ ঘটা অসম্ভব কিছু নয়। মাঝে মাঝে ঘটেও।

দেখতে দেখতে বেলা চারটে বাজলো। শীতের সূর্য এখন পশ্চিম আকাশে শান্ত বক পাখীর দল এখন নদী তীরের গাছের মাথায়। দেখে মনে হবে শ্বেত পদ্ম ফুঁটে আছে।

কাঁদা খোড়া পাখিরা এখনো পলি কাদার মধ্যে থেকে পোকা মাকড় খুঁজে বেড়াচ্ছে। পানকৌড়ির জল পিপির দল এখনও নদীর বুকে বনের পাখীদের ইতি মধ্যে নীড়ে ফেরার পালা শুরু হয়েছে। দলে দলে ফিরছে নানা জাতের পাখি।

জঙ্গল অফিসের প্রাঙ্গনে সবাই সমবেত। সামনেই কাঁটা তারের বেড়ার ধারে একটি দোচালা। বনবিবি, দক্ষিন রায়, মা জঙ্গলির মূর্তি সেখানে। এছাড়া বেদির মতো রয়েছে একটি। এটি গাজী পীরের ধাই।

বনে যাওয়ার আগে এই সব লৌকিক দেব দেবীকে প্রণাম জানানো এখানকার বিধি। সবাই তা মেনেও চলে।

একে একে সবাই এসে দাঁড়ালো দেব দেবীর সামনে। স্পীড বোটের চালক লখিন্দর এক মুঠো বাতাসা ছড়িয়ে দিলে। যে যেমন পারে কুড়িয়ে নিলে। লখিন্দর কিছুটা দুর্বল মনের মানুষ। ভোলানাথ বাবু ঘড়িতে সময় দেখলেন। ভোলানাথের পাশেই ছিলেন রানা। বললেন, তা



হলে এবার যাত্রা শুরু করা যাক।

এক এক করে সবাই স্পীড বোটে উঠলেন। ধীমান আর বিমান বসেছে গোলাম রহমানের স্পীড বোট কাজলে।

দুই ভাইকে ‘কাজল’-এ নিয়ে যাবে, ইচ্ছেটা গোলাম রহমানের।

প্রতিটি স্পীড বোটে দুজন করে সশস্ত্র যাত্রী। এ ছাড়া জঙ্গল অফিসের আরো কয়েক জন আছে।

বিশুর মতো ঠিকা কর্মচারীও ক জন এসেছে। কিন্তু আছে ধীমান, বিমানের সঙ্গে। ভজগোবিন্দ আর বটুকও আছে। আরো এসেছে জঙ্গল অফিসের বনবিবি আর দক্ষিণ রায়ে পূজারী। বনবিবিকে আবার বন দেবীও বলা হয়।

ঠিক সাড়ে চারটেয় যাত্রা আরম্ভ হলো। পরস্পরে কিছুটা ব্যবধান বজায় রেখে, পাশাপাশি হলেও কিছুটা আগে পিছু তিনটি স্পীড বোট চলতে আরম্ভ করলো।

নদীতে এখন জোয়ার। যেতে হচ্ছে উজানে। এই নিষ্ঠুর কালিন্দী বেশ শান্ত। উত্তর থেকে দক্ষিণে চলেছে নদী।

এই নদীর নাম কালিন্দী।

সূর্য তখন পশ্চিম দিগন্তে। চারিদিকে আঁধারের স্পর্শ। ক্লান্ত পাখীরা এখনও নিড়ে ফিরছে। সন্ধ্যা নামতে আর দেবী নেই। আর কিছুক্ষণের মধ্যে তাদের নিড়ে ফেরার পালা শেষ হবে। খড়কুটোর নিড় তাদের কত না প্রিয়।

ধীমান আর বিমান নীরব। দুজনে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখছে চারিদিকের মনরোম দৃশ্যপট। চলতি পথে দেখা চলমান ছবি।

যত এগিয়ে চলেছে স্পীড বোট, যত দক্ষিণে চলেছে, কালিন্দী তত বিস্তৃত হচ্ছে।

কালিন্দীর এপারে পশ্চিমবাংলা, ওপারে বাংলাদেশ। এপার ওপার দুপারেই সুন্দরবন।

সুন্দরবনের মত অরণ্য পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। জুড়ি নেই এখানকার রাজা বাঘ অর্থাৎ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের। এই রাজা বাঘের খ্যাতি দুনিয়া জোড়া।

সূর্য অস্ত গেল। সূর্যাস্তের শেষ মুহূর্তটি বড় সুন্দর। সূর্য যেন হঠাৎ হারিয়ে গেল।

তবু পশ্চিম আকাশ এখন লাল।

আস্তে আস্তে লাল রঙ ফিকে হয়ে আসছে।

শুরুপক্ষের ভাঙা চাঁদও দেখা গিয়েছে আকাশে। দেখা দিচ্ছে মিটি মিটি নক্ষত্র।

ভাঙা চাঁদ আর নক্ষত্রখচিত আকাশ মাথার উপর, সামনে-পিছনে অথৈ জলের গাও আর



দুপাশেগভীর বাদাবনের ছায়া-ছায়া রূপ— সব মিলিয়ে ধীমান, বিমানের চোখে এ যেন এক স্বপ্নের জগৎ।

এখনও জোয়ারের কাল শেষ হয়নি। স্রোতের বিপরীতে চলছে স্পীডবোট। ইঞ্জিনের একটানা ঘর্ঘর আওয়াজে পাশের লোকের কথাও ঠিক মত শোনা যায় না।

নদীর ডান তীর ঘেঁষে চলেছে স্পীড বোট। মাঝে মাঝে তিনটি স্পীড বোট থেকে সার্চ লাইট ফেলছে চালকের সাহায্যকারীরা। সামনের সার্চ লাইট তো আছেই।

আলোয় স্পষ্ট হয়ে উঠছে বন। আবার অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে।

বন এখানে দারুন গভীর।

ধীমান এক সময় গোলাম রহমানকে জিজ্ঞাস করলো, এ জায়গাটার নাম কি?

কথা কানে গেল না গোলাম রহমানের।

আরো গলা চড়িয়ে ধীমান জানতে চায় জায়গাটার নাম।

কালী চক। গোলাম রহমান বললে, এদিকে বড় মিয়াদের আস্তানা। হামেশাই দেখা যায়। কিন্তু কখন দেখা যাবে তার ঠিক নেই।

এখানে অনেকে বাঘকে বড় মিয়া বলে। সাধারণত মুসলমানরা।

গতকালকের কথা মনে পড়লো ধীমানের। বাঘ আর বন শূয়োরের সেই ভয়ঙ্কর লড়াই।

আবার যদি ওইরকম কিছু দেখা যায়।

ধীমান এ-ও ভাবলো, হয়তো দুটি প্রাণী কাল মারা গেছে। কিংবা জঙ্গলের মধ্যে আহত অবস্থায় পড়ে আছে।

স্পীড বোটের গতি মস্থর হল। পাশাপাশি তিনটি স্পীড বোট। এখন তিনটি বোটই কাছাকাছি। গতি আরও মস্থর হল।

সার্চলাইট এখন জঙ্গলের দিকে। কোমড়ে জঙ্গল। জোয়ারের জল এখন জঙ্গলের ভিতরে। তবু উঁচু এলাকার জল ঢোকার সম্ভবনা নেই।

মস্থর গতিতে স্পীড বোট এগোচ্ছে। সামনেই একটা খাড়ি। খাড়ি এখন জলে টইটম্বর। এখনও আরো জল ঢুকবে।

জোয়ার শেষ হলে, ভাঁটার টান শুরু হয়। তখন জঙ্গলে ঢোকা জোয়ারের জল নেমে যাবে। খাড়ির জলও কমতে থাকবে। অনেক অনেক খাড়ি আছে, তাতে ভাঁটার জল থাকে না। একেবারে শুকিয়ে যায় বললেও হয়।

দূর দূর অঞ্চল থেকে মাছমারারা আসে সুন্দরবনের গভীরে। আসে ডিঙি নৌকায়। এক-এক দলে আট দশটি ডিঙি থাকে। অনেক সময় আরো বেশি।

যারা মাছ ধরতে আসে, বনবিভাদের ছাড় নিয়েই তারা বনএলাকায় ঢোকে। জঙ্গলের মধ্যকার খাড়িতেই তারা মাছ পায় বেশী।

কিন্তু বিপদের ঝুঁকি থেকেই যায়। মাছ ধরতে বা মধু সংগ্রহে এসে বেশ কিছু মানুষ এখানে বাঘের হাতে প্রাণ দেয়। যদিও মানুষ এখানে সব সময় সতর্ক থাকে, তবু অনেক সময় বিপদ এড়াতে পারে না।

ভোলানাথ কি ভাবলেন, তিনি জানেন-খাড়ি পথে ভিতরে যাওয়ার কথা বললেই খাড়ি পথে জঙ্গলের গভীরতা বেশী করে উপলব্ধি করা যায়।

রানা আপত্তি করলেও সে আপত্তি টিকলো না।

এবারে সুন্দরী নামের স্পীড বোটটি আগে চললো। ওই বোটের আঁচের জঙ্গল বাবু।

জঙ্গল মহলের ওই এলাকা সবদিক থেকে ভয়ঙ্কর। এদিকটায় বাঘের সংখ্যাও বেশী। তারপর আরো ভয়ঙ্কর বন এলাকার মানুষরূপী শয়তানেরা এখানে যারা মাছ ধরতে আসে তাদের উপর চড়াও হয় শয়তান লুটেরার দল। এছাড়াও জঙ্গল এলাকায় ডাকাতি করে ওই পথ দিয়েই তারা পালায়। অনেক সময় লুটেরার দল এই সব এলাকায় খাড়ির মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে থাকে।

আরো আছে চোরা শিকারির উপদ্রব। যারা নানাভাবে বনের বাঘকে হত্যা করে বাঘের চামড়া ইত্যাদি পাচার করে। শাবক নিরীহ হরিণদেরও তারা হত্যা করে।

এই বনচারী শয়তানদের হাতে অনেক সময় বনবিভাগের কর্মীদের প্রাণ দিতে হয়।

এখন আর পাশাপাশি নয়, পরপর তিনটি স্পীড বোট চলেছে। দুদিকেই পড়ছে সার্চ লাইট। দুদিকের কোমড়জঙ্গল। কেমন যেন গা ছমছম করার পরিবেশ। মাঝে মাঝে চাঁদের আলো পড়ায় জঙ্গলের ভিতরের পরিবেশকে আরো রহস্যময় করে তুলেছে।

স্পীড বোটের গতি আরো মন্থর। এখন ইঞ্জিনের আওয়াজও আগের মত কানে আসছে না। এখন শুধু সামনের সুন্দরীর ইঞ্জিনটি চলছে। আর দুটি স্পীড বোট পরস্পরের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা। সংকীর্ণ খাড়ি পথে ঢুকছে স্পীড বোট।

ইঞ্জিনের যেটুকু আওয়াজ, তাতেই গাছের পাখপাখালিরা ডানা ঝাপটাচ্ছে। এক-একটা বানরও কুঁ কুঁ আওয়াজ দিচ্ছে।

আরো কিছুটা আসার পর দেখা গেল আড়াআড়ি ভাবে আরো একটা খাড়ি চলে গেছে। এখানেই স্পীড বোটের ইঞ্জিন বন্ধ করলো সারেঙ। চারদিকে নেমে এলো থমথমে নীরবতা। শুধু শোনা যাচ্ছে শীতের রাত ঝিঝির ডাক।।

শীতও বেশ। যদিও নোনা এলাকায় শীতের কামড় কম, কিন্তু জল জঙ্গলের মধ্যে শীত তো লাগবেই। তারপর এই রাত। এমনিতে জোলো জায়গার আবহাওয়া সঁাতসেঁতে।

সুনসান নীরবতার মধ্যে তিনটি স্পীড বোট নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। ইতিমধ্যে জোয়ারের টান শেষ হয়েছে। ভাঁটার টানেও এই সব বড় বড় এবং গভীর খাড়ির জল শুকোয় না। লঞ্চ বা বড় ডিঙি খুব ভিতরে না ঢুকলেও ছোট ছোট ডিঙি বা স্পীড বোট ভাঁটার শেষ কালেও ভিতরে যেতে পারে।

তিনটি স্পীড বোটে পনেরো জন আরোহী, এখানে কথা বললেও, সবাই চুপিস্বরে কথা বলাবলি করছে।

রাত এখন নটা। এখন কিন্তু বেশি রাত না, তবু অরণ্যের গভীরে মনে হয় কত রাত। এবারে খাওয়া দাওয়ার পালা। বিশু আর রনজয় নামে ছেলেটি হাতে হাতে খাবার পরিবেশন করছে। কয়েকটি বোতলে জল ভরা আছে, সেটা পেলে যে যার নিঃশ্বাস পান করবে।

খাওয়াদাওয়ার সময় সবাই কিছুটা খোলামেলা কথা বলতে আসক্ত করলো।

ভোজন পর্ব শেষ হয়নি হঠাৎ সবাই চমকিত হলো উচ্চ কণ্ঠের চিৎকার এবং টিন পেটানোর আওয়াজে। কোনো একক কণ্ঠে নয়, চিৎকার আসছে মিলিত কণ্ঠের। সেই সঙ্গে শব্দ আসছে টিন পেটানোর।

কিন্তু কোনদিক থেকে শব্দ আসছে অনুমান করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। গভীর অরণ্য এই এক সমস্যা।

তার মধ্যেও অনুমান করে নিতে হয়।

ভোলানাথ আর রানা অনুমান করে নিলেন ও। অন্যান্যদেরও সেই একই মত। শব্দ আসছে আড়াআড়ি ভাবে যে খাড়িটা উত্তর দক্ষিণে চলে গেছে সেই খাড়ির দক্ষিণ দিক থেকে।

তিনটি স্পীড বোট আবার ছুটে আরম্ভ করলো। সান্দ্রীরা শক্ত মুঠোয় রাইফেল ধরে খাড়ির এপার ওপারের দিকে তাকিয়ে রইলো।

খাড়ির এপার ওপারে সার্চ লাইট।

আলোর বৃত্তে জঙ্গলের দৃশ্যপট স্পষ্ট। এদিকে জোয়ারের জল জঙ্গলের গভীরে প্রবেশ করেনি। নদী তীরের চেয়ে এদিকটা অপেক্ষাকৃত উঁচু।

ধীমান, বিমান মনে মনে যথেষ্ট উত্তেজনা অনুভব করছে। ভারছে হয়তো আলোর বৃত্তে যে কোনো মুহূর্তে স্পষ্ট হয়ে উঠবে ভয়ংকর কোনো কিছু।

খাড়ি এদিকটা সংকীর্ণ। খাড়ির ওপর নুয়ে পড়েছে গাছের ডাল পালা। মনে হয় কোনো সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে চলেছে স্পীড বোট।

রুদ্ধ শ্বাস কয়েকটি মুহূর্ত।

রোমহর্ষক মুহূর্ত অপেক্ষা করছিল এতগুলি মানুষের জন্যে।

দেখা গেল একটি বিরাটাকার বাঘ হেতাল ঝোপের মধ্যে ঢুকে গেল।

পলকের জন্যে দেখা দিয়ে ঘন ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। ধীমান, বিমান তো ভয়ে সিঁটিয়ে গেল।

এরপরই এক মর্মান্তিক দৃশ্য।

একটি মানুষ পড়ে আছে নরম কাদার ওপর।

স্পীড বোট দাঁড়ালো। হর্ণ বাজালো বারবার। জঙ্গল মহল সচকিত হলো স্পীড বোট দাঁড়ানো। হর্ণ বাজলে বারবার। জঙ্গল মহল সচকিত হলো স্পীড বোটের হর্ণের আওয়াজে।

জঙ্গলবাবুদের নির্দেশে রাইফেল হাতে দুজন সান্দ্রী নরম পলিকাদার ওপর লাফিয়ে নেমে পড়লো।

ভোলানাথ এবং রানাবাবুও নামলেন। এগিয়ে চললেন মাটির ওপর পড়ে থাকা মানুষটির দিকে।

ধীমান, বিমান দুই ভাই-এর ইচ্ছে ছিল স্পীড বোট থেকে নামার। ইচ্ছের কথাটা গোলাম রহমানকে বলার সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছেটা কর্পূরের মতো উবে গেল। শোনা গেল একাধিক বাঘের

গর্জন।

কি ভয়ংকর গর্জন। শুনলে রক্ত হিম হয়ে যায়।

আবার এক সঙ্গে স্পীড বোট তিনটির হর্ণ বেজে উঠলো।

গোলাম রহমান দুই কিশোর বন্ধুকে বললে, বুঝতে পারছো, আমরা কোথায় কি নিয়ে থাকি। মুখের শিকার আমরা কেড়ে নিয়েছি। বড় মিয়াদের মেজাজ এখন টঙ।

ধীমান জিজ্ঞেস করলে, ওরা তো ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

গোলাম রহমান বললে, পারে, কিন্তু পড়বে না। ওরা বনের পশু, ওরাও ওদের ভালো মন্দ বোঝে। তাছাড়া মানুষকে ওরা রীতিমত ভয় পায়।

ধীমান বললে, বাঘটা যখন ছুটে গেল ঝোপের আড়ালে, তখন সত্যি মনে হচ্ছিল, জঙ্গলের



রাজাই বটে।

খাড়ি পথে আরো রোমাঞ্চকর মুহূর্ত অপেক্ষা করছিল। যে মানুষটিকে প্রথমে মৃত বলে মনে হয়েছিল, মানুষটি কিন্তু মৃত নয়। তবে রীতি মতো আহত এবং অচিন্তন।

আরো কয়েকজন নেমে গেল রানাবাবুর ডাকে। আহত মানুষটিকে ধরাধরি করে নিয়ে এলো স্পীড বোটে।

মানুষটি রীতিমতো জোয়ান এবং শক্ত সামর্থ।



আবার সোনা গেল বাঘের গর্জন।

ভোলানাথের নির্দেশে দু জন শাস্ত্রী রাইফেল চালালো। অরণ্য রাজ্যের ঘুম ভেঙে গেল। পাখ-পাখালিরা ডানা ঝাপটাতে শুরু করলো। বাঘের ভয়ে এপারের হরিণেরা তো আগে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে ছিল, কিন্তু খাড়ির অপর পারের হরিণেরা রাইফেলের গুলির আওয়াজে ইতস্তত ছোট্টাছুটি শুরু করলো। আলোর বৃত্তের মধ্যে তাদের স্পষ্ট দেখা গেল।

বানরেরা দারুণ বুদ্ধিমান। তারা জানে, তাদের কেউ হত্যা করবে না। বানরের দল এখন ঘটনাস্থলে গাছের ডালে ডালে। ওরা ডাল নেড়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

আহত জোয়ান মানুষটিকে ধরাধরি করে স্পীড বোটে তোলা হলো। মানুষটির ঘাড়ের ওপর থাকা মেয়েছে বাঘ। তারপর ঘাড়ের ওপর কামড়ও দিয়েছে। মানুষটির টুটি ধরে বাঘটি পালচ্ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শিকার ফেলে পালায়।

মানুষটির বেঁচে থাকার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না, বেঁচে গেছে পুরু গলা বন্ধ সোয়েটার আর হনুমান টুপির জন্য। নখ কিংবা দাঁত ঠিক মতো বসেনি। তবে বোঝা যায় কিছুটা ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। রক্তে ভিজ়ে গেছে সোয়েটার আর হনুমান টুপি।

রানাবাবু খুঁটিয়ে দেখলেন লোকটিকে। তারপর খুলে দিলেন মাথার টুপি, সোয়েটার হাত দিয়ে গলার কাছ থেকে নিচের দিকে নামিয়ে দিলেন। ভোলানাথ পাশেই ছিলেন, বললেন, রানাবাবু, আমার একটা কথা মনে হচ্ছে বাঘটা বোধহয় বুড়ো, সব দাঁত ছিল না।

রানাবাবু বললেন, আমিও সেই রকম চিন্তাই করছি।

স্পীড বোটে সব সময় প্রাথমিক চিকিৎসার জন্যে টুকিটাকি ওষুধ থাকে। এটা রাখতে হয় গভীর জঙ্গল টহল দেওয়ার সময়। এখানে এই জল জঙ্গলের যখন তখন বিপদ কিংবা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

এখন আর টিন পেটানোর আওয়াজ নয়, কিন্তু মানুষের কণ্ঠস্বর কানে আসছে।

শিকার মাছ মারার দল এখানেই আসছে। দু দিন আগেই মুচুকুন্দ পাঁড়ুই এর দল কালিন্দী অফিস থেকে ছাড় নিয়ে মাছ ধরতে এসেছে। ওরা প্রায়ই আসে। এছাড়া আরো কয়েকটি জোট বড় দল এসেছে ডিঙির বহর নিয়ে।

একএক এলাকা দিয়ে নয়, বিভিন্ন এলাকা দিয়ে মাছ মারার আসে বনের গভীরে। শীতের সময়ই বেশি আসে।

নিশ্চই স্পীড বোটের হর্ণ আর রাইফেলের আওয়াজ শুনে তারা ওদেকেই আসছে।

পাঁচটি ডিঙি এসে গেল। প্রায় জন তিরিশেক মানুষ। আহত মানুষটিকে দূর থেকেই দেখতে পেয়েছে তারা।



কাছাকাছি এসেই তাদের মধ্যে একজন, বোধহয় সাঁইবার, অর্থাৎ এদের দলপতি হবে, বলে উঠলো, বাবু, আমাদের সাধন বেঁচে আছে?

ভোলানাথ জবাব দিলেন। বেঁচে আছে, তবে জ্ঞান নেই।

স্পীড বোটের পাটাতনে অচেতন সাধন বসেছিল, আচমকা উঠে বসলো। ফুলকো চোখে উতিইতি তাকিয়ে বলে উঠলো, আমি এখন কোথায়?

বলে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলো সাধন, তারপর আবার ঢলে পড়লো পাটাতনে। ভয়ের ভূত এখনো চেপে আছে ওর মনে।

রানাবাবু তাকে দু হাতে তুলে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে উঠলেন, কি হলো চোখ চেয়ে দ্যাখো-কই চোখ চাও, তোমার ভয় কি! .

সাধন আবার চোখ মেলে তাকালো তার দলের লোকজনদের দেখলো, দেখলো জঙ্গল অফিসের সবাইকে। তারপর ফ্যাল ফ্যাল করে জঙ্গলবাবুর দিকে তাকিয়ে বললে, আমি তাহলে বেঁচে আছি সাহেব! নাকি —

কথা শেষ করতে পারলো না সাধন। আবার ঠকঠক করে কাঁপতে আরম্ভ করলো। তবে

এবারে আর আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো না।

মাছ মারা দলের সঙ্গে একজন গুণীন আছে। নাম হারাধন। বয়স হয়েছে হারাধনের। তুকতাক, ঝাড়ফুক নিয়েই আছে। ওই তার জীবিকা।

হারাধনের চেহারা খাঁকরা কাঠির মতো। হাড় জিরজিরে শরীর। লোকটির গায়ের চামড়া পোড়াপোড়া, মাথার চুল শনের মতো; দাঁত নেই প্রায়। দু চারটে যা আছে, খুব কালো। সে ফ্যাসফেসে গলায় বললে, ওর পাপেই ওর সব নাস হলো। আমারে অবিশ্বেস! বলে কি না, ঝাড়ফুক মস্ত তস্তুর কিছু না-এ সব হলো বুজরুকি। হারা গুণীনকে অবহেলা!

রানার মেজাজ গরম হয়ে উঠলো। একটা মানুষ বাঘের মুখ থেকে বেঁচে গেছে, তাকে নিয়ে এখন এ সব কথা। ওহে গুণীন-তোমারে জঙ্গলে নামিয়ে দিচ্ছি-যাও তো দেখি, জঙ্গলটা একটু ঘুরে আসবে। উজবুক কোথাকার।

হারাধনের শুকনো মুখ আরো শুকিয়ে গেল।

রানা আরো বললেন, তোমার আক্কেল কি হলো তো, লোকটার জন্যে প্রাণে এতটুকু ব্যাথা নেই! আশ্চর্য! যাও, আজোবাজে না বকে ওদিকে গিয়ে বসো।

ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হল সাধন। এত সময় একবারও সে তার যন্ত্রনার কথা বলেনি। এবারে সে ক্ষতস্থানে যন্ত্রনা অনুভব করছে। তার সোয়েটারের উপরের দিকটা রক্তে ভিজে গেছে তা-ও লক্ষ্য করলো। কাতর দৃষ্টিতে তাকালো এর-ওর মুখের দিকে। বললে, আমি বাঁচবোতো? আমি মরে গেলে আমার বাড়ির লোকরা যে না খেয়ে মরবে। দুটো পয়সার জন্য বাদাবলে মাছ ধরতে আসি।

ভোলানাথ এগিয়ে এলে, বললেন, ভয় কি। বাঘের মুখ থেকে যখন ফিরে এসেছো, তখন তো তোমার আয়ু বেড়ে গেল। এখন তোমাকে আমরা হাসপাতালে পাঠাবো। কিন্তু চিন্তা করোনা। তুমি ভালো হয়ে উঠবে।

সাধন যন্ত্রনার কাতর কণ্ঠে বললেন, না বাজে চিন্তা আর করবে না।

মাছমারাদের দলের খাঁইদার জটিলের মুখ থেকে ঘটনার কথা শুনে সবাই।

জোয়ারে খাড়িতে আড়াআড়ি জাল পেতেছিল মাছ-ধরিয়ে যাওয়া সবার ধারণা ছিল মাছ ভালই পড়বে। এ এলাকায় মাছও প্রচুর।

জাল পেতে ওরা রাতের খাবার খাচ্ছিল। ডিঙিগুলো নোঙর করা ছিলো। পাড়ের গাছের সঙ্গে কাছিও বাঁধা ছিল।

খেয়াল ছিল না কারো, যখন একটা ডিঙির মুখ পাড়ের কাছাকাছি হয়েছিল।

ডিঙির মুখে বসেছিলো সাধন। খাওয়া শেষ করে সব পান দোক্তা মুখে দিয়েছিলো—সেই সময় আচমকা বাঘের আবির্ভাব। তারপর আর কি, টুঁটি ধরে নিয়ে চললো সাধনকে।

সবার খাওয়া দাওয়া তখন শেষ হয়নি। তখন খাওয়া মাথায় উঠেছে, যে যার সড়কি, লাঠি নিয়ে তৈরী হবার আগেই শত্রু হাওয়া। তারপর ওরা চিৎকার করতে আরম্ভ করে। ক্যানেন্সারা অর্থাৎ টিনও পেটায় মশাল জেলে বাদায় নামবে ঠিক করে। কিন্তু স্পীড বোটের হর্ণের শব্দ শুনে ওরা বাদায় নামার ইচ্ছা ত্যাগ করে। স্পীড বোটের আওয়াজ শুনে ওরা ডিঙি বেয়ে এদিকে এগিয়ে আসে।

ওরা যখন কাহিনী শোনাচ্ছিল, সেই সময় সান্ত্বী বটু ওঝা, সাধনের সোয়েটার টুপি খুলে ফেলে ফাস্টটেডের বাক্স খুলে ওষুধ লাগিয়ে ব্যাভেজ করে দিচ্ছিলো। বটুক বনবিভাগের চাকরী পাওয়ার আগে এক ডাক্তারের ডিসপেনসারিতে কাজ করতো। সেখান থেকে তার এসব শেখা।

সাধনের ক্ষত খুব বেশী গভীর নয়। ঘাড়ের উপর থাবার নখ বসেছে, আর তিনটি দাঁত বসেছে বলে মনে হয়।

দাঁতের মাত্র তিনটি দাগ দেখে অনুমান করে নেওয়া যায়, বাঘ বা বাঘিনীটির বয়স হয়েছে। সব দাঁত তার নেই। তাছাড়া মোটা সোয়েটার ও হনুমান টুপি ছিল, তার জন্যেও কিছুটা রক্ষা পেয়েছে।

বটুক বললে, খুব বেঁচে গেচো ভাই। যাকে বলে যমের হাত থেকে ফেরা।

রানা বললেন, তোমকে বাঁচিয়েছে তোমার সোয়েটার আর টুপি।

সাধন বললে, গলায় একটা মোটা চাদরও জড়ানো ছিল। চাদরটা বোধ হয় পড়েই আছে জঙ্গলে।

ভোলানাথ এবারে হারাধন গুণীনকে ডাকলেন। বললেন, তোমার মস্ততেই চাদরটা বনে পড়ে আছে, তুমি তো মস্তুর তস্তুরে বাঘকে বশ করতে পারো। যাওনা চাদরটা নিয়ে এসো।

হারাধন গুণীন চুপ করে রইলেন।

হাজার হোক গুণীন মানুষ, এ দেশের মানুষ বনের গভীরে নদীতে, খাড়িতে মাছ ধরতে আসে, জঙ্গলে মধু সংগ্রহে যায়—পাছে ওদের বিশ্বাসে ফাটল ধরে তাই আর কথা বাড়ালেন না ভোলানাথ। চুপ করে গেলেন। এখন কাজ হলো সাধনকে স্পীড বোট করে হাসপাতালে পাঠানো।

একটি স্পীড বোট রওনা হয়ে গেল। একজন সান্ত্বী মাছ মারা দলের দু-জন আর বন অফিসের ঠিকা কর্মচারী একজন গেল সাধনের সঙ্গে।

ধীমান আর বিমান দুজনে চুপচাপ বসে। তারা ভাবছে বাঘ যদি আর একবার দেখা দিতো।

রানা জিজ্ঞেস করলেন ভোলানাথকে, কি, কোন দিকে যাবেন ভাবছেন। সামনে তো আর যাওয়া ঠিক নয়-বরং কালিন্দী দিয়ে জোড়াডাঙার দিকে যাওয়া যাক।

ভোলানাথ বললেন, আমিও সেই রকম ভাবনাই ভাবছি।

মাছ মারার দল এখানেই রইলেন। তাদের একজন আহত রয়েছে বলে মাছ ধরা বন্ধ থাকবে না। এ রকম ঘটনা ঘটা তো নতুন কিছু নয়।

মাছ ধরতে এসে বাঘের মুখে প্রাণ যায় কিছু মানুষের। মধু সংগ্রহ করা তো আরো বিপদজনক। কোনো কিছুতে ওদের কাজ থেমে থাকে না।

এবারে দুটি স্পীড বোট চলেছে। কাজল আর সুন্দরী।

খাড়ি পথ যেখানে শেষ হয়েছে, কালিন্দীতে মিশেছে খাড়ি, সেখানে সার্চলাইটের উজ্জ্বল আলোয় এক রোমহর্ষক দৃশ্য চোখে পড়লো।

বিরাটাকার একটা কাঁকড়া দু দুটো দাঁড়া দিয়ে কেউটে সাপকে কামড়ে ধরেছে। জঙ্গলের দূরন্ত কেউটে ফুঁসছে, ফণা তুলে ছোবল মারছে। কিন্তু কাঁকড়ার শক্ত খোলা-বৃথাই যাচ্ছে কেউটের ছোবল।

কেউটের মাঝখানটা ধরেছে কাঁকড়া।

নরম পলি কাদার ওপর চলছে কাঁকড়া আর কেউটের লড়াই।

দূরন্ত কালকেউটে একের পর এক ছোবল মারছে আর ভয়ংকর আক্রোশে ফোঁস আওয়াজ করছে।

কাঁকড়া সেই একভাবে দুটি দাঁড়া দিয়ে কেউটেকে কামড়ে আছে। সাপটাকে কামড়ে ধরে নরম পলির ওপর দিয়ে জলের দিকে নামছে। জ্বলে নামতে পারলে সাপটাকে নিয়ে ডুব দেবে।

প্রায় জলের কাছে পৌঁছালো কাঁকড়া। কাঁকড়ার কামড়ে কেউটের শরীর দু ভাগ হয়ে গেল।

নরম পলির খানিকটা জায়গা রক্তে লাল হয়ে গেল। লেজের দিকটা নিয়ে কাঁকড়া জলের নিচে চলে গেল। কাঁকড়া তো জলের গভীরে চলে গেল, কিন্তু কেউটের অধাংশের তখন ভয়ংকর রূপ। ফণা তুলে নরম পলির উপর একই জায়গায় চক্রাকারে ঘুরছে। এখনো তার ফোঁসফোঁসানি কমেনি।

গোলাম রহমান-এর পিছনেই বসে আছে দুই ভাই। তারা তো ভয়ে জড়োসড়ো। সাপ আর কাঁকড়ার এই রোমহর্ষক লড়াই — এ তাদের কাছে আজব দৃশ্য। এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। এ ধরনের ঘটনার কথা গল্পে পড়া যায়, কিংবা লোক মুখে শোনা যায়। আজ দুই কিশোর প্রত্যক্ষ করলো।

রানা আর ভোলানাথ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কাঁকড়া আর সাপের লড়াই দেখছিলেন। এত

সময় কোনো কথা বলেন নি। এবারে বললেন, রহমান — সাপটার একটা গতি করা দরকার। নয়তো ও যত সময় বাঁচবে তত সময় যাকে পাবে তাকে ছোবল মারবে।

গোলাম রহমান বললে, আপনি কি ভেবেছেন ও মরে যাবে? ও মরবে না। ও লেজকাটা কেউটে হয়েই বেঁচে থাকবে। তবে আমি ওর খেল খতম করে দিচ্ছি। ওকে বাঁচিয়ে রাখা ঠিক নয়।

বলে বাঁশের লগি দিয়ে সাপটাকে বার কয়েক আঘাত করে তাকে নরম পলির মধ্যে চেপে দিলে। তারপর একটু প্রতীক্ষা। দেখা গেল সাপটা কাদা মাথা শরীর নিয়ে কিলবিল করে ঠেলে উঠলো।

আবার বার কয়েক লগি দিয়ে সাপটির মাথায় অঘাত করলো গোলাম রহমান, সাপটা এবারে নিথর হয়ে গেল। এবারে লগি দিয়ে আবার নরম পলির মধ্যে পুঁতে দিলে।

আর অপেক্ষা করা নয়, স্পীড বোট আবার স্টার্ট দিল।

ভাঁটার টানে খাড়ির জল অনেকখানি নেমে গেছে। স্পীড বোটের নিজস্ব গতি আবার ভাঁটার টান — বেশ দ্রুত গতিতেই চলেছে স্পীড বোট কাজল আর সুন্দরী।

এর মধ্যে বার কয়েক ওয়ারলেসে নিজেদের গতিবিধির কথা বিভিন্ন বন-অফিসে জানিয়েও দিয়েছেন ভোলানাথ এবং রানা। এবারে হরিণ খোলা সপ্তমুখীর দিকে যাচ্ছেন, সে কথাও জানাতে ভোলেন নি। মাছমারাদের ওপর বাঘের হামলা, আহত সাধনকে হাসপাতালে পাঠানোর খবরও বন অফিসের সর্বত্র পৌঁছে গেছে।

খাড়ি পথ শেষ হলো। আবার কালিন্দীর বুকো। ভাঁটার টান এখন আরো জোরালো।

স্পীড বোট ছুটেছে এখন দুরন্ত গতিতে।

শীত আরো জাঁকিয়ে পড়েছে। কুয়াশাও জমাট বেঁধেছে। দূরে দৃষ্টি চলে না। নদী আর কুয়াশা মিলেমিশে একাকার। পারের জঙ্গল ঠিক মতো চোখে পড়ছে না।

এখনো ভাঙা চাঁদ আছে আকাশের কোণে; আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ও চাঁদ ডুবে যাবে। তখন নিশ্চিহ্ন অন্ধকার নামবে এই ভয়ংকর জল জঙ্গলের দেশে।

রাত এখন দুটো বাজতে দশ মিনিট।

বিমান বসে বসে বিমোচ্ছিল, কিন্তু ধীমান ঠায় বসে। এক সময় সে বিমানের গায়ে আঙুলের টোকা দিয়ে বললে, ওই ঘুমোচ্ছিস কেন? এখন একটা রাত কি আর আসবে? ভেবে দ্যাখ তো, কি ভয়ংকর-সুন্দর রাত।

বিমান আড়ামোড়া ভেঙে হাই তুললো। বললে, জানিস ভাই খাওয়াটা আমার একটু বেশী

হয়ে গেছে। শরীরটা কেমন টিসটিস করছে। আর কি জানিস, তোর কি মনে হচ্ছে জানি না, তবে ওই সাপ আর কাঁকড়ার কথা মনে করলে আমার কেমন অশ্বস্তি হচ্ছে। ওই কাঁকড়া আমরা আবার ভালোবেসে খাই।

তুই বাজে বকিস না তো! এখন তোর যত সব বিদঘুটে চিন্তা। ধীমান বললে, চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে সিহর হয়ে বোস। আর আড়াই ঘন্টা পরেই তো পূব আকাশের রঙ বদল হবে।

আড়াই ঘন্টা নয়, তিন ঘন্টা। এখন তো সবে রাত দুটো।

জানিস ভাই, আমার মনে হচ্ছে, আমরা এখন নতুন কোনো স্বপ্নের জগতে এসে পৌঁছেছি। যে জগতে কুয়াশার রঙ ছাড়া আর কিছু নেই। এখন সব কিছু স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে।

চাঁদ ডুবে গেল। কুয়াশা এখন আরো গাঢ়। চাঁদ যাক না যাক, নদীর বুকে অন্ধকার তেমন যে হয়ে নামে না।

বোধহয় কুয়াশার জন্যেই স্পীডবোটের গতি এখন কিছুটা মস্থর। যতই চেনা জানা হোক, হয়তো এই জল-জঙ্গলের গেশের নদী, খাল, খাড়ির নাড়িনক্ষত্র জানে গোলাম রহমানের মতো সারেঙরা, কিন্তু যদি কোনো রকমে দিক ভুল হয়, কিংবা শেষ ভাঁটায় যদি ডুবো চার ধাক্কা খায়, তাহলেই বিপদ। তাই অভিজ্ঞ সারেঙরা বিপদজনক এলাকায় সাবধান হয়।

যত দক্ষিণে চলেছে অর্থাৎ সমুদ্রের কাছাকাছি, নদী কত বিস্তৃত হচ্ছে।

রাত যত পড়ছে কুয়াশাও তত গভীর হচ্ছে। দৃষ্টি বাধা পায় ঘন কুয়াশায়।

ভাঁটার টান শেষ হয়ে আসছে। আর কিছুক্ষণ বাদেই জোয়াড় লাগবে। রাত শেষ হতে আর দেরি নয়।

বৃষ্টির ফোঁটার মতো পড়ছে কুয়াশার জল। গায়ের সোয়েটার, আলোয়ান সব সজীবে সজীবে উঠেছে।

দুটি স্পীড বোটে সবাই জেগে। অবশ্য তার জন্যে কারো কষ্ট নেই।

যারা বনবিভাগে কাজ করেন, তাঁদের এমন রাত প্রায়ই আসে যখন সারারাত জেগে কাটাতে হয়। বন কর্মীদের কাছে রাত জাগা কোনো ব্যাপার নয়। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা — ছয় ঋতু বারোমাস যখন তখন বন কর্মীদের ছুটেতে হয়। কত সময় কত বিপদের মুখোমুখি হতে হয়। যত সময় বন কর্মীদের বেঘোরে প্রাণ যায়।

দুটি স্পীড বোট পাশাপাশি এগিয়ে চলেছে। এখন গতি খুবই মস্থর। সার্চলাইটেও কিছু দেখা

যাচ্ছে না।

রাত শেষ হয়ে আসছে। উপরের কুয়াশা আরো ঘন হয়ে নামছে নিচের দিকে।
ঘন কুয়াশা ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ছে না।

রাত শেষ হয়ে আসছে। বৃষ্টির ফোঁটার মতো টুপটাপ করে পড়ছে কুয়াশার আড়ালে।
পাশাপাশি দুটি স্পীড বোট চলছে অত্যন্ত মন্থর গতিতে। দুটি সার্চ লাইট ছাড়া আর কিছু
চোখে পড়ছে না।

ধীমান, বিমানের মনে এখন বিচিত্র এক আনন্দের স্বাদ।
বিমান বললে, এ যেন এক কল্পলোক। যেন আমরা এক রূপকথার দেশে এসে পৌঁছেছি।
ধীমান বললে, সত্যিই, আমারও সেই রকম মনে হচ্ছে। যেন এক অজানা লোকের পথে
আমরা পাড়ি জমিয়েছি।

আচমকা স্পীড বোট সুন্দরীর সারেঙ চিৎকার করে উঠলো, রহমান ভাই — আমরা ভুল
জায়গায় এসেছি। পারের হৃদিশ পাও কি?

গোলাম রহমান এদিক ওদিক তাকালো। কিন্তু কিছুই তো দেখা যায় না। কুয়াশা এখন
এমনই ঘন।

গোলাম রহমান জিজ্ঞেস করলো, তোমার এ ধারণা হলো কি করে দোস্ট।
সুন্দরী থেকে জবাব এলো, কেন মনে হলো বলতে পারবো না। তবে মনে হলো এই
পর্যন্ত। অনেক কথা অনেক সময় আপনা থেকেই মনে হয়।

গোলাম রহমান রীতিমতো চিন্তায় পড়লো। চিন্তা অন্যদেরও। রানা আর ভোলানাথের মনে
হচ্ছে, কুয়াশা তাঁদেরকে বিপ্লবের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে।

রানা বললেন, আর এগিয়ো না — এখানেই চক্রাকারে ঘুরপাক খাওয়া ভালো। ভোর হতে
আর দেরি নেই।

মন্থর গতিতে একই জায়গায় ঘুরতে লাগলো স্পীড বোট দুটি।

পূর্ব আকাশের রঙ বদল হচ্ছে। ঘন কুয়াশা যদিও তবু সূর্য ওঠার সংকেত যথেষ্ট।
কুয়াশা এখন আরো ঘন। ওপরের কুয়াশা নিচে নামছে। বড় বড় ফোঁটায় জল পড়ছে।
কুয়াশার জল। মনে হচ্ছে যেন টিপটিপ বৃষ্টি হচ্ছে।

আস্তে আস্তে কুয়াশা ফিকে হয়ে আসছে। পূর্ব আকাশ লাল। তবে সূর্যের মুখ কুয়াশার
ওড়নায় ঢাকা। ঘড়ির সময় বলছে, সূর্যোদয় হয়েছে।

আরো কিছু সময় এখানে অপেক্ষা।

ধীমান, বিমান চারদিকে ফিরে ফিরে দেখছে। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তবু পূর্বের আকাশের ক্রমশ রঙ বদল হচ্ছে।

এবারে কুয়াশা দ্রুত উঠে যাচ্ছে।

ধীমান, বিমানের দৃষ্টি পূর্ব দিকে। কখন সূর্যের মুখ দেখা যাবে।

সূর্যের মুখ দেখা গেল। রূপালি সূর্য। ঝলমল রোদদূর ছড়িয়ে পড়লো।

এখন চোখের সামনে আরো বিস্ময়।

চারদিকে অথৈ জল। কূল কিনারা চোখে পড়ছে না।

ধীমান, বিস্ময় নিয়ে জিজ্ঞেস করলো তার ছোট্টকাকে, আমরা এখন কোথায়?

রানা বললেন, প্রায় সমুদ্রের কাছাকাছি। আমরা এখন সপ্ত মুটীজ মোহনার কাছাকাছি। জানিস এদিকে আমাদের আসার কথা ছিল না — কুয়াশার জন্যেই এটা হলো। এতে কারো কোনো দোষ নেই। দ্যাখ, ভালো করে চারদিকে তাকিয়ে দ্যাখ —

রানা দুই ভাইপোকে দুপাশে নিয়ে বললেন, জানিস, আমরা এখন সমুদ্রের কাছাকাছি। আরো কিছুদূর দক্ষিণে গেলে সুন্দর একটি দ্বীপ চোখে পড়বে, যেটি নতুন দ্বীপ। নাম পূর্বাশা।

বিমান বললে, আমরা সেখানে যাবো না?

রানা বললে, না। এই স্পীড বোট ভরসা করে সেখানে যাওয়া ঠিক নয়। তাছাড়া আরো অনেক রকম বাধা নিষেধ আছে। তবে যদি কখনো সুযোগ আসে, তাদের নিয়ে যাবো।

ধীমান বললে, এই রকম দিক ধূল হলে বিপদ তো হতে পারে?

পারে বৈকি। কত সময় চরম বিপদ আসে। রানা বললেন, অনেক সময় জীবন অঙ্গি চলে যায়। যাক তো, ও সব কথা।

স্পীড বোট আবার চলছে।

এখন জোয়ার। জোয়ারের টানেই ফিরে চলেছে। ডেউ নেই নেই করেও আছে। স্পীড বোট একটু ওঠানামা করছে।

বিশাল বিস্তৃত নদী। সপ্ত মুখীর মোহনার কাছাকাছি জায়গাটা। চারদিক থেকে এখানে নদী নালা এসে মিলিত হয়েছে।

গভীর জল এখানে। এই দুটি স্পীড বোট ছাড়া অন্য কোনো নৌকা বা লঞ্চ নেই।

দুটি স্পীড বোট দ্রুত গতিতে ছুটেছে।

ইতিমধ্যে বিশু আর রূপচাঁদ সবাইকে চা দিয়ে গেছে। এই চা পান নিছক রাত জাগার ক্লান্তি দূর করার জন্যে।

ভোলানাথ বললেন, দুর্বা চার আমরা একটু থামবো গোলাম রহমান সাহেব।

গোলাম রহমান বললে, আমি ও সেই রকম ভেবে রেখেছি। তবে নামার চিন্তা করো না।
বিমান জিঞ্জেস করলে ভোলানাথকে, সেখানে জঙ্গল আছে?

না রে। দুই নদীর মোহনার মুখে পলি জমে জমে একটা দ্বীপের মতো ধূ ধূ বালির চর।
সেখানে শুধু দুর্গা ঘাসের মতো বড় বড় ঘাস আর কিছু গাছ পালা। বনবিভাগ সেখানে নানা
ধরনের গাছের চারা বসিয়েছে। কোনো সময় হয়তো ওখানে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠবে। ওখানে
এক ধরনের মারাত্মক জৌক আছে।

জোয়ারের টানে স্পীড ও বোট খুবই দ্রুত গতিতে চলেছে। এখন নদীর এপার ওপার
স্পষ্ট।

নদী পারে কসাড় জঙ্গল। এখন এক আশ্চর্য জগতের দরজা খুলে গেছে ধীমান বিমানের
চোখের সামনে।

জঙ্গলের কাছ দিয়েই চলেছে স্পীড বোট। চোখে পড়ছে হরিণ, বানর আর পাখ-পাখালি।
তবে এখানে বকের সংখ্যা খুব বেশী। হরিণেরা বোটের শব্দে সচকিত হয়ে ফিরে তাকাচ্ছে। কিছু
কিছু হরিণ ছুটে পালাচ্ছে। কিন্তু বানরগুলোর ভয়টয় নেই। ওরা কত সহজ ভাবে ফিরে তাকাচ্ছে
এদিকে। সুন্দর বনে বানরেরাই সব চেয়ে সুখী প্রাণী।

সব চেয়ে ভালো লাগে শাদা বকগুলোকে। ওরা কেউ গাছে বসে আছে। সেউ-বা জঙ্গলের
ধারে, কিংবা নরম পলির ওপরে।

আকাশে উড়ছে গাঙ চিল, পানকৌড়িরা আসছে জলে। জোয়ারের টানে ওরাও ভেসে
ভেসে যাচ্ছে।

এক জায়গায় চোখে পড়লো কি দৃশ্য। দেখবার মতো। কি দল হরিণ ছুটছে, তাদের
পিঠে চেপে বসে আছে বানর। মানুষ যেমন ঘোড়ায় চড়ে, তেমনি। এই জঙ্গলে বানর আর হরিণ
অদ্ভুত মিতালি।

দেখে ধীমান বিমান হাততালি দিয়ে উঠলো।

আর এক জায়গায় এক আজব দৃশ্য। দুটি কুমির চিৎ হয়ে ভেসে আছে। কয়েকটি পাখি
তাদের গায়ের পোকা খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে।

রানা বললেন, এই পাখিরা কুমিরের বন্ধু। কুমির মুখ হাঁক করবে-পাখিরা ওদের দাঁতের
পোকা খুঁটে খুঁটে খাবে। মুখ বন্ধ করলে পাখিদের প্রাণান্ত, কিন্তু তা করবে না।

স্পীড বোট ছুটে গেল, কিন্তু কুমিরের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। শীতের রোদ্দুর গায়ে মেখে
আরাম করে শুয়ে আছে।

দুই চরের সৌন্দর্য দেখে ধীমান, বিমান মুগ্ধ হলো। স্পীড বোট দাঁড়ানোর সঙ্গে দুই ভাই এক মনে হাততালি দিয়ে উঠলো।

ধীমান বললে, এখানে আমরা নামবো তো।

বিমান বললে, নিশ্চয়ই নামবো।

গোলাম রহমান স্পীড বোট নোঙর করে বললে, শোনো ভাইয়েরা, নামার ইচ্ছেটা পূরণ করে বলে মনে হয় না। জায়গাটা খুব নিরাপদ নয়।

দুই ভাই-এর মন খারাপ হলো। ওরা ভেবেছিল চড়ে নেমে খানিক বেড়িয়ে বেড়াবে মনের আনন্দে।

বিশু বললে, শোনো ভাইয়েরা, মুখটুক ধুয়ে নাও। জল খাবার খেতে হবে তো।

মুখ ধোয়া থেকে আরম্ভ করে যা কিছু, সবেরই ব্যবস্থা স্পীড বোটে। স্পীড দুটি খুব মোটা নয়।

জলখাবার-এর সাধারণ ব্যবস্থা। মুড়ি, চানাচুর আর কলা। এসবই সঙ্গে আনা হয়েছে।

ভজ গোবিন্দ ওদিকে কেরোসিন স্টোভ জ্বলে চায়ের জল গরম করছে।

এই সময় দু জন সান্ত্বী গাম বুট পরে চরে নামলেন। স্পীড বোট থেকে বোঝা যাচ্ছিল না, সান্ত্বীরা নামার পর বোঝা গেল ঘাস প্রায় কোমর সমান উঁচু। প্রায় উলুখাগড়ার মতো।

সান্ত্বীরা শক্ত মুঠোয় রাইফেল ধরে রেখেছে।

এক সময় এই চার টাওয়ার ছিল। এখন নেই। প্রয়োজনে লাগে না বলে। তবে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর একটা চৌকি এখানে তৈরী করার পরিকল্পনা আছে।

বিমান বললে, ছোটকা, আমরা নামবো?

রানা বললেন, তোরা যে ওই ঘামের জঙ্গলে ঢাকা পড়বি। এখানে নামা যাবে না। তাছাড়া বিপদও আছে। বাঘ বাবুরা নদী সাঁতরে মাঝে মাঝে এই চরে আসে। এখানে এখন হুঁসি আর বুনো শূয়ার অনেক। তাই মাঝে মাঝে জঙ্গলের বাঘ নদী সাঁতরে চলে আসে চরে। হয়তো এক-একটা এখানে কিছুদিন রয়েও যায়। এছাড়া এই চরে মাছের-উৎপাতও আছে। আর রয়েছে বাঘা-বাঘা জেঁক।

এ কথা শোনার পর আরে নামার ইচ্ছে রইলো না দুই ভাইয়ের।

প্রায় ঘন্টা দুয়েক সময় কাটলো এই চরের কাছে। এখানে অপেক্ষা করার কারণ স্পীড বোটের ইঞ্জিনকে বিশ্রাম দেয়া এবং ইঞ্জিনের কলকজা ঠিক আছে কিনা দেখে নেয়া।

চলতি স্পীড বোটে রাস্তা করারও অসুবিধে, তাই এখানে দাঁড় করিয়ে রেখে ভজগোবিন্দ

আর বটুক রান্নার কাজও সেরে রেখেছে। রান্না এমন কিছু নয়, ডিমের ঝোল আর ভাত। আর শেষ পাতে মুখ বদলানোর জন্যে জলপাই-এর আচার আছে।

এখন কানায় কানায় জোয়ারের জল। ভাঁটা আরম্ভ হতে আর দেরি নেই। ভাঁটায় যাওয়া মানে স্রোতের বিপরীতে যাওয়া। স্রোতের বিপরীতে যাওয়ার আলাদা একটা শিহরণ আছে। একটু ভয়-ভয় করে, মনে হয় তাই বুঝি বোট উল্টে গেল— বেশ লাগে এই ভয় জড়ানো শিহরণ।

দ্রুত ছুটছে স্পীড বোট জোয়ারের জল এখন জঙ্গলের গভীরে ঢুকছে। মাঝে মাঝে খাড়ি। কোনো কোনো খাড়ি সংকীর্ণ, কোনো কোনো খাড়ি বেশ প্রশস্ত। জঙ্গলের এই এলাকায় মাঝে মাঝে কুমির চোখে পড়ছে। আর রয়েছে বানর। হয়তো জল ঢুকেছে বনে হরিণেরা ভিতরে চলে গেছে। ধারে কাছে আসতে পারছে না।

জোয়ার শেষ। ভাঁটার টান এখন নদীতে। এবারে একটা চওড়া খাড়ি পথ ধরলো স্পীড বোট।

এই খাড়ি পথ গেছে চামটার গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। শুধু তাই নয়, চামটার এই এলাকার জঙ্গলের রূপ যেমন ভয়ংকর, তেমনি সুন্দর। এই জঙ্গল মহলে বাঘের সংখ্যাও বেশ কঠিন।

খাড়ি পথে চলেছে স্পীড বোট। গতি বেশ দ্রুত। আগু পিছু নয়, পাশা পাশি চলেছে স্পীড বোট। তবে ব্যবধান বজায় রেখে। দুই সারেঙই সতর্ক এবং অভিজ্ঞ। দীর্ঘদিন হয়ে গেল তারা সুন্দরবন এলাকায় আছে।

ধীমান, বিমান দুই ভাই জঙ্গলের দিকে চোখ রেখে বসে আছে। শরীরে কিছুটা অবসাদ। শীতের মধ্যে সারারাত জাগা, অবসাদ আসবে বৈকি। তারপর চলাফেরা নেই, ঠায় বসে থাকা।

জঙ্গলের মধ্যে মাকড়সার জালে মতো ছড়িয়ে আছে নদী, খাল, খাড়ি। এখন এক গোলকধাঁধা। অভিজ্ঞ মানুষেরও এখানে ভুলভাল হয়ে যায়।

মাঝে মাঝে হরিণ চোখে পড়ছে। আর গাছের ডালে ডালে বানর তো আছেই। হরিণ আর বানরের মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন আছে।

গাছের উপর থেকে কচি কচি ডাল ভেঙে হরিণের সামনে ফেলে দিচ্ছে বানর। হরিণ তা আনন্দের সঙ্গে খাচ্ছে।

বিশু এক সময় বললে, জানো ভাইয়েরা, বানর গাছের উপরে থাকে তো, ওরা বাঘের গতিবিধি জানতে পারে। যদি বাঘ আসছে দেখতে পায় বানর, তখন সঙ্গে সঙ্গে ‘কু’ শব্দ আওয়াজ করে তারা। এই শব্দের মানে হরিণেরা বোঝে। তারা আগে ভাগে সতর্ক হয়ে নিরাপদ জায়গায় যেতে চায়। তবে কি সব সময়ে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছাতে পারে? পারে না। কত সময়

নিরীহ হরিণের প্রাণ যায় বাঘের হাতে। হরিণেরা বেঁচে আছে তাদের দ্রুতগামিতার জন্য।

বিমান বললে, বাঘেরা কি হিংস্র, তাই না বিশুদ্ধ।

বিশ্বর কিছু বলার আগে ধীমান বলে উঠলো, হিংস্র বলছিস কেন? প্রকৃতির নিয়মে বাঘ এইরকম হয়েছে। ওরাতো হরিণকে ওদের খাবার ভাবে। বাঘ যদি হিংস্র হয়, তাহলে আমরা মানুষেরা কি? ভেবে দেখ আমরা কি না খাই, কি না করি।

বিমান একটু ভাবলো। বললে, যা বলেছিস। একটু ভেবে দেখলে মনে হয়, মানুষই সবচেয়ে নিষ্ঠুর এবং হিংস্র। খবরের কাগজ পড়লে তা বোঝা যায়। শুধু মারামারি, রক্তারক্তির খবর। রোজ যে কত মানুষ মরছে তার ঠিক নেই।

খাড়ি বাঁক নিয়েছে। বাঁক পেরিয়ে দেখা গেল জঙ্গলের ভিতর দিয়ে আরেকটি খাড়ি এসে মিলেছে এই খাড়িতে।

দুটি স্পীড বোটের গতি মস্থর হলো। দুই সারেঙ মিলে আলোচনা করলো কোন দিকে যাবে।

পথনির্দেশ দিলেন ভোলানাথ। বললেন, ডানদিকের খাড়ি দিয়ে বেরিয়ে যাও।

ডানদিকের খাড়িটা কিছুটা চওড়া। তবে জঙ্গল ওদিকে বেশী গভীর। তাছাড়া এই জায়গাটা নানাদিক থেকে বিপদজনক। প্রতি বছর চামটার এই এলাকায় বেশ কিছু অঘটন ঘটে। চোরা শিকারীরা এই এলাকায় মাঝে মাঝে হানা দেয়। বিষ প্রয়োগে বাঘকে হত্যা করে। মাংসের সঙ্গে মিশিয়ে দেয় মারাত্মক বিষ। বনের পশুকে শান্তিতে বাঁচতে দেয়না মানুষ।

এই এলাকা দিয়ে ভোলানাথ যেতে চাইলেন এইজন্যই যদি রাজা বাঘের দেখা মেলে। যদিও দেখা পাওয়াটা নেহাৎ ভাগ্যের ব্যাপার।

খাড়ি অনবরত বাঁক নিয়েছে, তাই স্পীড বোটের গতি কিছুটা মস্থর। তারপর ঝুঁটি টানে জলও বেশ নেমে গেছে।

একটা বাঁকের মুখে এসে এক ভয়ঙ্কর এবং অভাবিত দৃশ্যের মুখোমুখি হতে হলো। সান্ত্বিত রাইফেল বাগিয়ে টানটান হয়ে দাঁড়ালো। স্পীড বোট দাঁড়িয়ে পড়লো। তবে ইঞ্জিন চালু আছে। সামনে এমন এক দৃশ্য যা সচারচর দেখা যায় না। তবে এমন ঘটনা ঘটে। আজ এখন যা চোখের সামনে ঘটছে।

চোখের সামনে এক অভাবিত দৃশ্য। একটি বাঘ খাড়ির জলে একপাড়া থেকে আরেক পাড়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু কিছুতেই এগোতে পারছে না। মনে হয় জলের নীচে কোনো কিছু তাকে টানছে।

বাঘ প্রাণপনে চেষ্টা করছে ডাঙায় উঠতে, কিন্তু পারছে না। খানিকক্ষন আক্রোশে গড়গড় করছে।

সাস্ত্রীদের উদ্দেশ্যে রানাবাবু বললেন, আশেপাশে নজর রেখো। আমার মনে হয় বাঘটা হাঙর কিংবা কামটের খপ্পরে পড়েছে। কুমীর নয়।

ঘুম পাড়ানি গুলিও সঙ্গে আছে। একজন সাস্ত্রীর কাছ থেকে রাইফেল নিয়ে তাতে ঘুমপাড়ানি গুলি ভরলেন রানা। তাক করলেন বাঘটির দিকে। বাঘটা একবার স্পীড বোটের দিকে তাকিয়ে বিরাট মুখ ব্যাদান করে চাপা গর্জন করে উঠলো। কী ভয়ঙ্কর গর্জন। রাইফেল তাক করার জন্য বাঘের এই গর্জন।

রানা রাইফেল নিচে নামিয়ে রাখলেন। সাস্ত্রীদেরও বললেন, তোমরা সতর্ক থাকো, তবে রাইফেল তাক করো না। আমার মনে হয় হাঙর কিংবা কামটের খপ্পরে পড়েছে। ও এখন শুধু বাঁচতে চাইছে।

ভাবনাটা মিথ্যে নয়। দেখা গেল খাঁড়ির খানিকটা জায়গার জল লাল হয়ে উঠলো। জলের নীচে হাঙর বা কামটের দল জল তোলপাড় করলো। বাঘটা চেষ্টা করেও উঠতে পারছে না। এবারে ফিরে তাকালো স্পীড বোটের দিকে। তার দৃষ্টির ভাষা অন্যরকম। করুন তার দৃষ্টি। মনে হয় সে বলতে চাইছে, আমাকে বাঁচাও। আমি ভয়ানক বিপদে পড়েছি।

স্পীড বোট আবার এগিয়ে চললো। প্রায় বাঘের কাছাকাছি। বাঘের পিছন দিকটা জলের নিচে। সামনের পা দুটি অগভীর জলে। এবং দুটি পা পলি কাদায় ডুবে গেছে।

সমস্ত ব্যাপারটা এখন স্পষ্ট হলো। কামটে কেটে নিয়ে গেছে বাঘের পিছনের পা দুটি। এখন ওর চলার শক্তি নেই। পিছন জলের নীচে। বেশ বোঝা যাচ্ছে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। জল লালাচে হয়ে গেছে।

রানা আর ভোলানাথ দুজনে কিছু পরামর্শ করছেন। সাস্ত্রীরা রাইফেল হাতে চুপচাপ বসে। ধীমান, বিমানতো রীতিমত অবাক। এখন ভয় নয়, বাঘটার জন্য তাদের কষ্ট হচ্ছে।

দুই জঙ্গলবাবুর পরামর্শ শেষ।

রানা নয়, ভোলানাথ বাবু পরপর দুটি ঘুমপাড়ানি গুলি দিয়ে বিদ্ধ করলেন বাঘের সামনের দুটি পা। বাঘটা একবার ভয়ঙ্কর গর্জন করে উঠলো। সে তো বুঝতে পারেনি ওই ব্যবস্থা।

মুহূর্তে বাঘটা ঢলে পড়লো।

এবারে নাইলনের দড়ি দিয়ে তার সামনের পাদুটি কেটে নিকটে জড়িয়ে নিয়ে টেনে তোলা হল স্পীড বোটে। বাঘটির যেন আর কোনো চেতনা নেই।

বাঘটির দিকে ফিরে তাকানো যাচ্ছে না। পিছনে দুটি পা হাঁটুর ওপর থেকে কেটে নিয়ে

গেছে কামট। রক্ত ঝড়ছে। এ ছাড়া তলপেটের খানিকটা মাংস খুবলে নিয়েছে।

যে ভাবে রক্তক্ষরণ হচ্ছে তাতে বাঘটির বাঁচার আশা কম।

বাঘের খবর ওয়ারলেসে সুন্দরবনের প্রতিটি বন অফিসে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। কলকাতায় বনবিভাগে সদর দপ্তরেও জানানো হয়েছে চিকিৎসক পাঠাবার জন্যে।

কিন্তু রানা এবং ভোলানাথ দু জনের মনে একই প্রশ্ন, চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া যাবে কি! যে ভাবে রক্তক্ষরণ হচ্ছে তাতে মনে হয় না বাঘটি বাঁচবে।

ঝড়ের গতিতে ছুটে চলেছে স্টীড বোট। যেতে হচ্ছে স্রোতের বিপরীতে। ফোয়ারার মতো ছিটকে ছিটকে উঠছে। আর ওপরে উঠেছে ইঞ্জিন। ভয় জড়ানো শিহরণ দুই ভাই-এর মনে।

ধীমান, বিমান আছে স্পীড বোট 'কাজল'-এ। আহত বাঘ সুন্দরীতে। ধীমান, বিমান চেয়েছিল তাদের বোটে-ই বাঘটা থাকুক। কিন্তু না রানা, না ভোলানাথ কেউ তা চাননি। কারণ ওই রক্তক্ষরণ দেখলে কিশোর মনে বিকল্প প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে।

বাঘটা একভাবে ঘুমিয়ে আছে। রক্তও ঝরছে। তবে আগের চেয়েও কিছুটা কম। হয়তো শরীরে আর রক্ত তেমন নেই বলে।

সবার বিশ্বাস বাঘটি বাঁচবে না। বাঘটা ঘুমের মধ্যেই মারা যাবে। কিন্তু বাঘটা বাঁচুক, এটা সবাই চায়।

খাড়ি পথ শেষ হলো। এখন যেতে হবে রায়মঙ্গলের বুকুর ওপর দিয়ে। ভাঁটার টান এখন বেশ তীব্র। তাই টানের বিপরীতে যেতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে স্পীডবোট একটু টাল মাটাল করছে।

স্রোতের বিপরীতে যে গতিতে চলছে, সাধারণত জরুরি প্রয়োজনে ছাড়া এত দ্রুত গতিতে স্পীডবোট চালানো হয় না। এই সব দুরন্ত নদীতে এত যাত্রী নিয়ে এই রকম দ্রুত গতিতে স্পীড চালানো বিপদজনক।

কিন্তু তাড়াতাড়ি পৌঁছানো দরকার— যদি বাঘটির চিকিৎসার সুযোগ মেলে।

যে পথ আসতে কমপক্ষে পাঁচ ঘন্টা সময় লাগে, সেই পথ অতিক্রম করলো পৌনে তিন ঘন্টায়।

রীতিমতো বিপদের ঝুঁকি নিয়ে স্পীডবোট চালিয়ে নিয়ে এসেছে সারিগুড়া। একটু অসতর্ক হলেই একবারে সলিল সমাধি। কামট, হাঙর ওত্ পেতে আছে।

ঝিঙেখালি জঙ্গল অফিসের জেটিতে যখন কাজল আর সুন্দরী এসে ভিড়লো তখন সূর্যদেব পাটে বসেছে।

এখানে আসার খবর আগেই পৌঁছে গেছে। স্পীডবোটের হর্নের শব্দ শুনে বন কর্মীদের সবাই এসে হাজির।

স্পীডবোটের সবাই ক্লান্ত। কাল সারারাত গেছে জাগরণে, আর আজ এই বেলা অন্ধি। সেই সকালে যা জল খাবার জুটেছিল, তারপর খাবার তৈরি ছিল, হয়তো চলার পথে যা হোক খেয়ে নেয়া যেত, কিন্তু খাওয়ার ইচ্ছে কারো ছিল না।

আহত বাঘটির ঘুম এখনো ভাঙেনি। তবে বেঁচে আছে। বন কর্মীরা বাঘটিকে ওপরে তুললো। অফিস প্রাঙ্গনে খড় কুটো বিছিয়ে একটি ত্রিপল পেতে দেয়া হয়েছে। তারই ওপর শায়িত বাঘটি। বাঘের সামনে দুটি পা নাইলনের গড়ি গিয়ে বেঁধে দেয়া হয়েছে। যদিও উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতা নেই, তবু ঘুম ভাঙলে সামনে কাউকে পেলে থাবা মারতে পারে, এই জন্যেই সতর্কতা। বনের বাঘ বলে কথা। তারপর আহত বাঘ সাধারণ ভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। ব্যাঘ্র প্রকল্পের সদর দপ্তর থেকে বার্তা এসেছে বেশ কিছুক্ষণ আগে। চিকিৎসক দল আসছেন।

সবার অনুমান চিকিৎসক দলের আসতে যত তাড়াতাড়ি হোক, রাত আটটা বেজে যাবে। কলকাতা থেকে আসা — সামান্য পথ তো নয়।

রাত সাড়ে আটটা। বনবিভাগের লঞ্চ এসে দাঁড়ালো ঝিঙেখালি ফরেস্ট অফিসের জেটি ঘাটে।

শুধু চিকিৎসক দল নয়, ব্যাঘ্র প্রকল্পের কয়েকজন পদস্থ ব্যক্তিও এসেছেন। তার মধ্যে প্রকল্পের অধিকর্তা কল্যাণ সেনগুপ্ত আছেন।

ব্যাঘ্র প্রেমিক হিসাবে কল্যাণ সেনগুপ্তের পরিচিতি আছে। শুধু ব্যাঘ্র নয়, কল্যাণবাবু পশু প্রেমিক। পশু পাখি নিয়ে অনেক বই ও লিখেছেন।

সৌর শক্তির বেশ কয়েকটি আলো জ্বলছে। বন অফিস এখন আলোকিত এ ছাড়া দুটো হাজারকণ্ড জ্বালা হয়েছে।

বাঘটির ঘুম ভাঙবে বলে মনে হয় না। চিকিৎসকদের অভিমত এই। তবু প্রাথমিক ভাবে যা করণীয় তা করলেন। এবারে ওঁরা আলোচনা করে ঠিক করলেন, লঞ্চে তুলে বাঘটিকে কলকাতায় নিয়ে যাবেন।

কিন্তু এই মুহূর্তে যাওয়া সম্ভব নয়। রাত এগারোটা বেজে গেছে বলে নয়, ~~এখন~~ ঘুমন্ত বাঘটিকে লঞ্চে তোলা ঠিক হবে না। রক্ত ক্ষরণ আবার নতুন করে শুরু হতে পারে। বরং সকালের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করাই ভালো। যদি তার মধ্যে অঘটন না ঘটে যায়।

রাত বারোটা। এবারে সবার বিশ্রাম নেবার পালা। ধীমন, বিমল দু জনেই এখনো এক ভাবে বাঘটির কাছে।

সবাই তাদেরকে খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে পড়তে বলেছিল কিন্তু তারা কথা কানে নেয়নি। বাঘটির দেহ ঢেকে দেয়া হলো। মুখটি খোলা।

বিমান বললে, সত্যি যেন রাজা ঘুমিয়ে আছে।

ধীমান বললে, রাজাই বটে।

এই মুহূর্তে রাজা বাঘের কাঁপুনি শুরু হলো। চটকটানিও। চিকিৎসকেরা তখনো দাড়িয়ে
কিংবা বসে। কল্যাণবাবু ঝুঁকে পড়লেন বাঘটির মুখের কাছে।

অকস্মাৎ বাঘটি চোখ মেলে তাকিয়ে একবার কাতর আর্তনাদ করে উঠলো। তার বিশাল
শরীর অদ্ভুতভাবে কাঁপতে কাঁপতে স্থির হয়ে গেল।

কল্যাণবাবু গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। চিকিৎসকরা মাথা নিচু করলেন।

ধীমান, বিমান দুই ভাই যেন পাথর হয়ে গেছে, তাদের দু-চোখে জল টল মল করছে।
বন অফিসে নেমে এলো শোকের ছায়া।



BanglaBook.org

ভয়ের মুখোমুখি

জায়গাটা ভয়াল ভয়ঙ্কর। রায়মঙ্গল আর বাঘনা এখানে মিলেছে। দূরন্ত দুই নোনা গাঙের জল সেখানে অহরহ উথালি-পাথালি করছে। গাঙের এপার ওপার-একদিকে আবাদ এলাকা-মানুষের বসতি, অন্যদিকে গাঙের পারে মরিচাঝাঁপি-সজনে খালির গভীর অরণ্য। সেখানে হিংস্র স্বাপদের অবাধ রাজস্ব। একটু দক্ষিণে পাখিরালা, শীতের মরশুমে দেশ-বিদেশের পাখিরা আসে সেখানে। সুদূর সাইবেরিয়া অঞ্চলের পাখিরাও আকাশে ডানা মেলে দূর পথ পাড়ি দিয়ে পাখিরালায় এসে শীতের মরশুম কাটিয়ে যায়।

রায়মঙ্গল আর বাঘনা গাঙের মোহনার মুখে খানিকটা জমি। গেঁয়ো গরান কেওড়া ওড়া পিটুলি গাছের জঙ্গল সেখানে। তবে এ জঙ্গল আবাদ এলাকায়। জায়গাটার নাম ‘বনবিবির ঠাই’।

বনের মধ্যে উঁচু জায়গাটায় ছোট একটা দোচালা। গোলপাতার ছাউনির নিচে বনবিবির মূর্তি। পাশে আরো একটি পুরুষমূর্তি—দক্ষিণ রায়ের। দোচালার সামনে কেওড়া গাছের নিচে একটা মাটির টিবি। এটা গাজী পীরের আখড়া।

এসব দেব-দেবীর কথা পুঁথি-পুরাণে নেই, মানুষের মন থেকে এ-সব দেব-দেবীর কল্পনা। আর এ তল্লাটের মানুষেরা তাদের বিশ্বাসের অনেকখানি গচ্ছিত রেখেছে এইসব দেব-দেবীর কাছে। যেখানকার অরণ্য জুড়ে রাজা বাঘের দল রাজত্ব করছে, যেখানে নোনা গাঙের বুকে কিলবিল করছে ভয়ংকর কুমির, কামট আর হাঙরের দল, যেখানে দেব-দেবীর আশীর্বাদ না থাকলে বাঁচা যায় না—এই গভীর বিশ্বাস এখানকার লোকের মনে।

বনবিবি, দক্ষিণ রায়, শাজঙ্গলি বা বদর পীরের নাম নিয়ে এ তল্লাটের মাঝি দূরন্ত নোনা গাঙ পাড়ি দেয়, কালবোশেখীর মেঘ দেখেও দুঃসাহসী মাঝি দামাল গাঙে পাড়ি জমায়। আর বনবিবি, গাজী পীর, দক্ষিণ রায়ের নাম নিয়ে এ তল্লাটের মানুষ গভীর জঙ্গলে খাড়িতে মাছ ধরে, বনে কাঠ কাটে, গোলপাতা সংগ্রহ করে, শেষ-ফাল্গুনে কিংবা চৈত্রের প্রথমে গভীর অরণ্যে মধু সংগ্রহ করতে যায় দল বেঁধে।

এবার মধুর মরশুম এলো।

শীত শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল তোড়জোড়। বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন দল,



সবারই মনে তখন মধু-সংগ্রহের নেশা।

গভীর অরণ্যে মৌমাছির চাক বেঁধেছে। মধুর চাক। বনের ফুল থেকে তিল তিল করে মধু

সংগ্রহ করে সঞ্চয় করেছে সে চাকে।

গেঁয়ো, গরান, কেওড়া-কত রকমের গাছ, কত অসংখ্য রকমের ফুল! মৌমাছির ফুলে ফুলে বিচরণ করেছে, আহরণ করেছে মধু তারপর সঞ্চয় করেছে চাকে।

তাদের সঞ্চয়ের কাল শেষ হয়ে যায় চৈত্রের মাঝামাঝি। তারপরই মধুর লোভে ছুটে যায় মানুষ গভীর অরণ্যে। ভয়-ভাবনা তারা পিছনে ফেলে রাখে। তাদের একমাত্র লক্ষ্য মৌমাছির আশ্রয় মৌচাক।

মধু-সংগ্রহের মরশুম এলেই মধু-সন্ধানী মানুষদের রক্তে কেমন যেন নেশা জাগে। তীব্র সে

নেশা। তার টানই আলাদা।

দুরন্ত গাঙ, দুর্গম অরণ্য-একটা ভয়ংকর বিভীষিকার মধ্যে গিয়ে পড়তে হবে, তবু যাওয়া চাই।

কবে মধুর মরশুম আসবে, এ আশাতেই কাটে গোটা বছর। ফাল্গুন এলেই সাজ-সাজ রব আরম্ভ হয়ে যায় মৌ-পাগল মানুষদের।

বনে বাঘ বিষধর সাপ, বুনো শূয়ার, জলে ভয়ংকর কুমি, কামট, হাঙর, তবু পরোয়া নেই যেতেই হবে জঙ্গলে যেখানে মৌমাছির চাক বেঁধেছে।

রায়মঙ্গল আর বাঘনার গাঙের মুখে ‘বনবিবির ঠাই’-এ ভিড় করেছে অনেক মানুষ। ছোট ছেলে-মেয়ে থেকে আরম্ভ করে আশি বছরের বুড়োও এসেছে।

বনবিবির দোচালা নতুন করে ছাওয়া হয়েছে, নতুন করে রঙ করা হয়েছে বনবিবি আর দক্ষিণ রায়ের মূর্তিটিকে। গাজী পীরের দরগার টিবিটিতে মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়েছে।

বনবিবির ঠাইয়ে পূজো-মানত না চুকিয়ে মধু-সংগ্রহকারীর দল গাঙে ডিঙি ভাসাবে না। তারপর চাই বাউলির অনুমতি।

বাউলি হলো দলের পথ-প্রদর্শক, বাউলির মন্ত্র-তন্ত্র হলো তাদের রক্ষা কবচ।

ধন্য বাউলি এ তল্লাটের পুরনো মানুষ। বয়স সত্তরের কোঠায়, কিন্তু এখনো সে পঁচিশ বছরের যুবককে টেকা দিতে পারে।

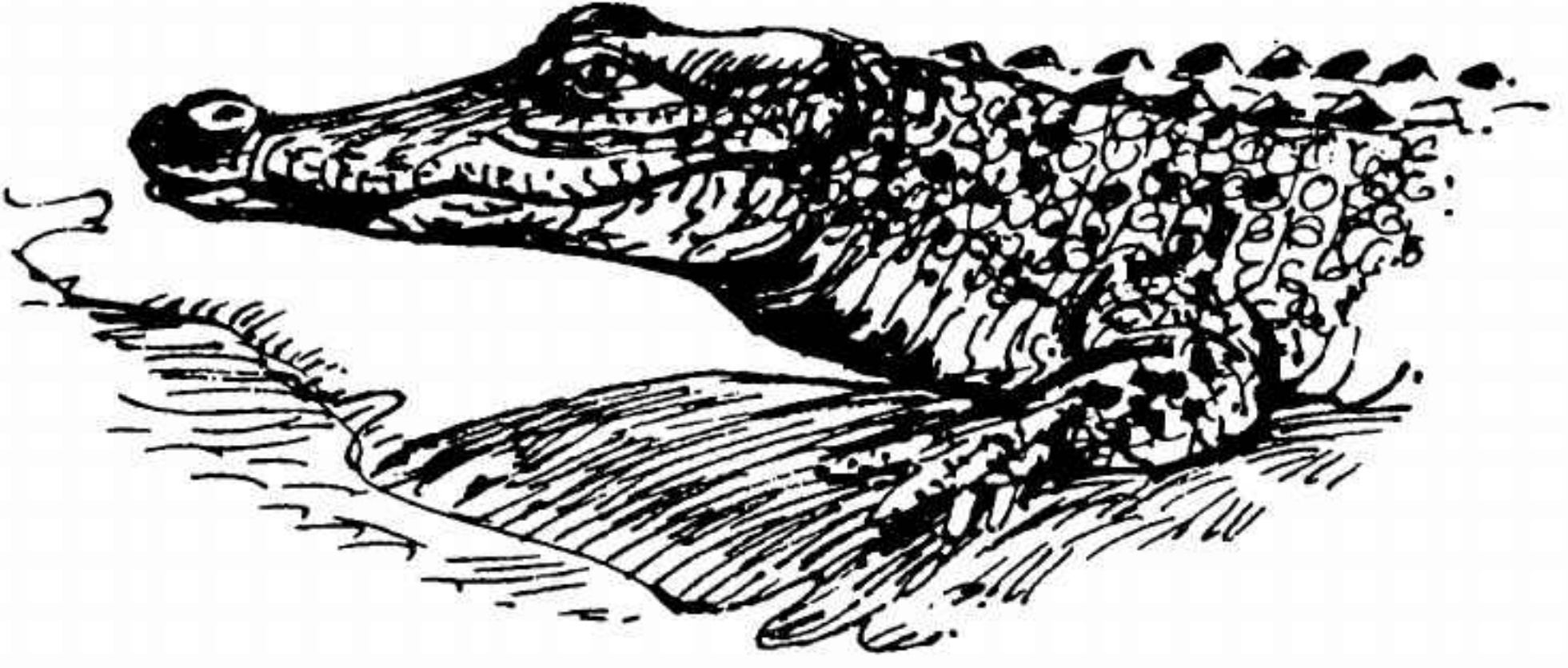
ধন্য বাউলিকে দেখলেই ভয় হয়। চেহারাটা যেমন মজবুত, মনটাও তেমনি শক্ত। অমাবস্যার মতো কালো তার গায়ের রঙ, ইস্পাতের মতো মজবুত পেশী, একমাথা কাঁচা-পাকা ঝাঁকড়া চুল, আর চোখদুটো আগুনের গোলার মতো। চেয়ে থাকা যায় না সে চোখের দিকে।

দশাসই চেহারা ধন্য বাউলির। হাজার মানুষের ভিড়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও তাকে চিনে নেওয়া যায়। আর তার গলার সুর যেন শাঁখের আওয়াজ।

বনবিবির ঠাইয়ে অপেক্ষা করছে একদল মানুষ। কানাই ঠাকুর এসে পূজো করেছে দক্ষিণ রায় আর বনচন্ডীর। বনচন্ডীকেই লোকে বলে বনবিবি। গালেব গাজী এসে গাজী পীরের বেদীর ওপর কাঁচা দুধ ঢেলে দিয়েছে। এদিকের কাজ-কর্ম সারা, এখন অপেক্ষা শুধু ধন্য বাউলির আসার।

সন্ধ্যা হলো, এখনো এলো না ধন্য বাউলি। অথচ আজ সকালেও সে জনিয়ে গেছে, যেখানেই থাকুক সন্ধ্যার মধ্যেই সে আসবে।

ভাঁটা লাগবে রাতের প্রথম প্রহর শেষ হলে, সেই টামেই ডিঙি ভাসাতে হবে। তিন ভাঁটার পথ গেলে তবে কালিচকের বাদা। ধন্য বাউলি বলেছে, এবারে মরিচঝাঁপির বাদায় নয়, কালিচকের



বাদার যাবে ধন্য বাউলি।

কালিচকের বাদার কথা শুনে অনেকেই একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল, কিন্তু ধন্য বাউলির মুখের ওপর কথা বলার শক্তি কারো নেই। সুতরাং আর কী—ধন্য বাউলির যা ইচ্ছে, তা-ই হবে।

ধন্য বাউলি আসছে না—এ চিন্তাটা তাই সবার।

আট-দশটা হারিকেন ঝুলছে গাছের ডালে। জায়গাটা না-আলো, না-অন্ধকার।

দোচালায় জ্বলছে কারবাইডের গ্যাস। সে আলোয় জ্বলজ্বল করছে বনবিবি আর দক্ষিণ রায়ের সদ্যরঙ করা মূর্তি।

জড়ো হাওয়া মানুষগুলো এক-একবার দেখছে দোচালার দিকে, আর এক-একবার ফিরে চাইছে ভেড়ি পথের দিকে।

কিন্তু যার জন্যে ভেড়ি পথের দিকে চেয়ে থাকা সেই ধন্য বাউলির এখনো পাত্তা নেই।

সবার মনেই দুশ্চিন্তা তবে কি খেয়াল নেই ধন্য বাউলির? মানুষটার একটু হুঁশ-ধ্যান কম, তবে এসব ব্যাপারে তার তো ভুল হয় না।

হঠাৎ সুরিন্দর চিৎকার করে উঠলো, ওই যে বাউলি আসতিছে!

সকলেরই চোখ পড়লো গাঙপারে আলপথের দিকে। দশাসই চেহারা মানুষটা গাঙপারের আলপথের ওপর দিয়ে হনহন করে হেঁটে আসছে।

হেই মা বনবিবি, হেই বাবা দক্ষিণ রায়, জয় বাবা গাজী পোষ!—বাজখাঁই গলায় তিন দেব-দেবীর নাম উচ্চারণ করে মাটির ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো ধন্য বাউলি।

খানিক সময় মাটির ওপর মুখ খুবড়ে পড়ে থেকে এদিক-ওদিক গড়াগড়ি দিলে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে রক্তচক্ষু মেলে তাকালো বনবিবির মুখের দিকে। আচমকা চিৎকার করে উঠলো,

হেই মা বনচন্ডী, মান রাখিস মা, হেই বাবা দক্ষিণ রায়, গাজীপীর, মান রাখিস, জান রাখিস।

সবাই অবাকচোখে চেয়ে আছে ধন্য বাউলির দিকে। যেন মূর্তিমান ভয়ংকর দাঁড়িয়ে আছে। মানুষটার মাথায় ঝাঁকড়া কাঁচা-পাকা চুলগুলো ফুলেফেঁপে উঠেছে, সর্বঙ্গে ধূলো মাখা, গোল চোখদুটো জবাফুলের মতো লাল, আশ্তে আশ্তে মানুষটা এগিয়ে যায় দোচালার দিকে। গ্যাসের আলোয় বাউলির ভয়ংকর চেহারাটা স্পষ্টতর হয়ে ওঠে।

এবার দোচালার সামনে থেকে একমুঠো ধূলো তুলে নেয় বাউলি।

মুঠোয় ফুঁ দিয়ে বিড়বিড় করে কী সব মন্ত্র আওড়ায়। তারপর যারা যারা বাদায় মধু সংগ্রহ করতে যাবে, তাদের কাছে আসতে বলে।

পর পর জন তিরিশেক মানুষ এগিয়ে আসে এক-এক করে। মাতন,, বীরু, শ্রীদাম, নফর, শশী—এরা সব পুরনো লোক। বিশ-পঁচিশবার বাদায় মৌ ভেঙে এসেছে এরা। নতুনদের দলে রয়েছে চন্দর, গুপি, বিশু ছাড়া আরো কয়েক জন।

কিন্তু ওই ছেলেটি কে যার মুখে এখনো গোঁফ-দাড়ির রেখাও দেখা দেয়নি?

ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে ধন্য বাউলি। বাউলির চোখে পলক পড়ে না, পলক পড়ে না ছেলেটিরও চোখে।

বাউলির চোখের দিকে অমন অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা কম কথা নয়। অথচ চেয়ে আছে ছেলেটি।

তোর নাম কী?—বাউলির চোখেই আগে পলক পড়ে।

চন্দন।

বাবার নাম কী?

কদম ঢালি।

অ, তুই কদম ঢালির বেটা।—ধন্য বাউলির কণ্ঠস্বর যেমন ভরাট তেমনি ভয়ংকর। বলে, তুই মৌ ভাঙতে যাবি?

যাবো বলেই তো এইচি।

চন্দন তখনো দাঁড়িয়ে ধন্য বাউলির মুখের দিকে তাকিয়ে।

তোর মনে ভয় নাই?

না।

তোর বাপের কথা মনে আছে ?

চন্দন মাথা নাড়ে। তার মনে আছে বাবার কথা। শুধু তার কেন, এ তল্লাটের সবাই জানে কদম ঢালি আজ থেকে পাঁচ বছর আগে মৌ ভাঙতে গিয়ে মরিচঝাঁপির বাদায় বাঘের পেটে

গিয়েছিল।

কদম ঢালির মতো জোয়ান এ তল্লাটে ছিল না। আর তার বুকে ছিল অসীম সাহস। ভয় কী তা সে জানতো না। বোশেখ মাসের ঝড়-তুফানেও সে রায়মঙ্গলে পাড়ি দিয়েছে, একা ডিঙি ভাসিয়ে গিয়েছে সমুদ্রের কাছাকাছি সপ্তমুখীর কাছে। কত সময় মনের খেয়ালে জঙ্গলের খাড়ির মধ্যে ঢুকেছে তার শখের পানসি নিয়ে। কিন্তু কোনো দিন কোনো বিপদ তাকে স্পর্শ করেনি।

এমন দিনও গেছে, কদম বল্লম নিয়ে একা জঙ্গলে ঢুকেছে। বাঘের মুখোমুখিও হয়েছে অনেক বার। বাঘ পিছু হটেছে তো কদম পিছিয়ে যায়নি ভয়ে।

আরো কত কথা গল্পের মতো ছড়িয়ে আছে কদম ঢালিকে নিয়ে। বর্ষার কামট-কুমির কিলবিল করে গাঙে, সেই বর্ষায় দুরন্ত নোনা গাঙ কদম সাঁতরে পার হয়েছে। মেছো কুমিরকে আছড়ে মেরেছে সে। কদমকে লোকে বলতো বাদাবনের ভীম।

সেই দুঃসাহসী মানুষটার ছেলে চন্দন। বয়স কতই বা-পনেরো কি ষোলো, অথচ এরই মধ্যে তার শরীরের বাঁধুনি শক্ত-সমর্থ জোয়ান মানুষের মতো। এতগুলো মানুষের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তারই মাথাটা সবচেয়ে উঁচু।

ধন্য বাউলি চন্দনের দু'কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দেয়। বলে, কি রে কদমের বেটা, ভয় করবে না তো?

চন্দন মাথা নাড়ে। ভয় তার করবে না।

সাবাস। ধন্য বাউলি বলে, কদম ঢালির বেটা না হলে কি এমন কথা কেউ বলতে পারে? এই স্যাঙাতরা সব শোন, চন্দন কী বলে।

চন্দন তো এখানকার কারো অচেনা নয়, সবাই তাকে চেনে-জানে, ভালোবাসে। আর এ কথাও সবাই জানে, ছেলেটা তার বাবার মতো সাহস পেয়েছে।

ধন্য এবারে চন্দনের পিঠে মৃদু চাপড় মেরে বলে, বুঝলি ছোঁড়া, তুই আমার নতুন স্যাঙাত। যা, বস্ গে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। ঘোর অন্ধকার নেমেছে বনবিবির ঠাইয়ে।

ধন্য বাউলি 'হেই মা বনবিবি' বলে এগিয়ে যায় দোচালার দিকে। লুটিয়ে পড়ে ধূলোর ওপর। বিড়বিড় করে মন্তর-তন্তর আওড়ায় আর মাঝে মাঝে 'হেই মা বনবিবি' বলে চিৎকার করে ওঠে।

যে সব মানুষ জঙ্গলে যাবে, তারা সব জড়ো হয়ে বসে আছে মাটিতে বিছিয়ে দেওয়া বিচালির ওপর। তাদের সকলের চোখ কখনো বনবিবির মুখের ওপর, কখনো ধন্য বাউলির দিকে।

কিছু মানুষ এসেছে, যারা মধু-সন্ধানীর দলকে ডিঙিতে তুলে দিয়ে ফিরে যাবে।

ধন্য বাউলি উঠে দাঁড়ালো এক সময়। ফিরে তাকালো জড়ো হওয়া মানুষগুলোর দিকে।
জনে জনে পরিয়ে দিলে সিঁদুরের ফোঁটা, হাতে বেঁধে দিলে লাল ডোর।

এবারে ধন্য বাউলি চিৎকার করে বলে উঠলো, জয় মা বনবিবি, জয় বাবা দক্ষিণ রায়।

সকলে সমস্বরে বনবিবি আর দক্ষিণ রায়ের নামে জয়ধ্বনি দিলে।

মুখর হলো বনবিবির ঠাই।

এবারে মানুষগুলোর গাঙপারে যাওয়ার পালা। আগে চললো ধন্য বাউলি, পিছনে চললো
অন্যেরা।

গাঙে এখন ভাঁটার টান লেগেছে। এই টানেই ভেসে যাবে তিনটি ডিঙি।

উত্তর থেকে দক্ষিণে—রায়মঙ্গলের ওপর দিয়ে ভেসে যাবে সমশেরনগর হয়ে কালিচকের
জঙ্গলে।

গাঙপারে কেওড়া গাছের শিকড়ের সঙ্গে বাঁধা তিনটে ডিঙি। ওই ডিঙি তিনটিই যাবে।

ডিঙির ছইয়ের ভিতর বিশ-বাইশ দিনের মতো চাল, ডাল, তেল, নুন, পেঁয়াজ আর পাঁচটি
কোলাভর্তি মিষ্টি জল। যদিও গাঙে অঁথে জল, তবু সে জল মুখে দেবার উপায় নেই। দারুণ
নোনা।

গাঙপারে এসে দাঁড়ালো ধন্য বাউলির দল। কয়েক জন লোক হ্যারিকেন নিয়ে তাদের
ডিঙিতে তুলে দিতে এসেছে।

জঙ্গলে ওত পেতে আছে হিংস্র বাঘ, ভয়ংকর সরীসৃপ, তাছাড়া আরো কতো রকমের ভয়।

ভয় যেখানে ভয়ংকর, সেখানেও এরা দুরন্ত সাহসে বুক বেঁধে এগিয়ে যাবে মৌচাকের
সন্ধানে।

ফাল্গুনের শেষ। দক্ষিণা বাতাস বইছে। পাগল-করা বাতাস। এদিকে ভাঁটার টান লেগেছে
রায়মঙ্গলে। দখনে বাতাসে উথালিপাথালি করছে গাঙের জল। ভাঁটার টান যত বাড়বে, নোনা
গাঙ তত পাগল হবে।

পাড়ে বাঁধা ডিঙি। একে একে উঠলো সবাই। ধন্য বাউলি গিয়ে বসেছে ডিঙির মাথায়।
যারা মধু সংগ্রহে যাচ্ছে, তাদের আপনজনদের অনেকেই গাঙ পারের। ডিঙি যত সময় দৃষ্টির
বাইরে না যায়, তত সময় তারা অপেক্ষা করবে গাঙ ধারে।

বনবিবির নাম নিয়ে এবারে ডিঙি ছাড়লো। মুহূর্তে ভাঁটার টানে তীর ছেড়ে খানিক এগিয়ে
গেল। পারের ভেড়িতে যারা অপেক্ষা করছিল, চলে গেল তারা।

ধন্য বাউলির দল চলেছে মধুর সন্ধানে।

সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে গাঙ দেশের চেহারা বদলে যায়। কেমন নীরবতা নামে চারদিকের পরিবেশ জুড়ে। গাঙের বুকে অন্ধকার তেমন ঘন মনে না হলেও পারের জঙ্গলের চেহারা ভয়ংকর হয়ে ওঠে। মনে হয়, দুনিয়ার যত অন্ধকার জমাট বেঁধেছে ওই অরণ্যরাজ্য জুড়ে।

গাঙের বুকে উথালিপাথালি করছে ঢেউ। ঢেউয়ে ডিঙি দুলছে। দাঁড় টানছে না কেউ, শুধু হাল ধরে বসে আছে এক-এক জন। বাকি মানুষেরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ডিঙির ওপর শুয়ে বসে গল্পে-কথায় মেতেছে।

কিন্তু চন্দন সবকিছুর বাইরে। ডিঙির ছইয়ের ওপর বসে আছে সে। দৃষ্টি তার কখনো আকাশ ছুঁয়ে গাঙের বুকে ফিরে আসছে, কখনো গাঙের এপারে ওপারে নিস্তব্ধ জমাট অন্ধকারের দিকে। জঙ্গলের দিকে। জঙ্গলের গাছপালাগুলো অন্ধকারের সঙ্গে জমাট বেঁধে আছে।

অ্যাই চন্দন, কী ভাবিস রে?

গুপীর কথায় চমক ভাঙে চন্দনের। গা ঝাড়া দিয়ে বলে, কী আর ভাববো? দেখতিছি।

গুপী বলে, আমার কেমন যেন ভয় হচ্ছে রে চন্দন। মনে হচ্ছে, না এলেই ভালো হতো রে! শেষটা যদি কিছু ঘটে যায়!

চন্দন চাপা হুমকি দিয়ে বলে, ও সব অলঙ্ঘুণে কথা বলবি তো বাউলিরে বলে দেবো। পুরুষ মানুষ, তার আবার ভয় কী রে? মরণ হয় হবে, তা বলে মরণের কথা ভাববি কেনে?

গুপী চুপ করে যায়। তার দু চোখ তখন গাঙ-পারের নিকষকালো অন্ধকারের দিকে।

আর চন্দন তখন আকাশের দিকে চেয়ে ভাবছে। এত বড় আকাশ এর আগে কখনো দেখেনি সে।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাঁটার টান আরো বাড়ে। ভাঁটার টান যত বাড়ে, গাঙ তত পাগল হয়। ডিঙিগুলো ঢেউয়ের দোলায় দুলতে দুলতে এগিয়ে চলে দক্ষিণে। যত দক্ষিণে যায়, গাঙ তত বিস্তৃত এবং ভয়ংকর মনে হয়।

ডিঙির সওয়ারিরা পালা করে ঘুমোয়। পালা করে হাল ধরে, দাঁড় টানে।

ভাঁটার টান শেষ হলেই জোয়ার লাগবে গাঙে। জোয়ার লাগার মুখেই পৌছতে হবে হাটখোলার ঘাটে। সেখানে ডিঙি বেঁধে অপেক্ষা করতে হবে আবার কখনো ভাঁটার টান লাগবে গাঙের বুকে।

রাত তখন গভীর। ধন্য বাউলির দল ডিঙি 'গেরাবি' করলে সমশেরনগরের হাটখোলার ঘাটে।

আশেপাশে আরো কটা ডিঙি, কিস্তি, হাটুরে নৌকা 'গেরাবি' করা। ধন্য বাউলির দলের তিনটে ডিঙি।

দলের সবাই যার যার পাটাতনের ওপর চাটাই বিছিয়ে শুয়ে পড়ে। চৈত্র মাসের ফুরফুরে নোনা হাওয়ার কেমন যেন আমেজ জড়ানো-মানুষগুলো ঘুমিয়ে পড়ে দেখতে দেখতে।

শুধু ঘুম নেই চন্দনের চোখে। সে কখনো চিত হয়ে শুয়ে আকাশ দেখছে, কখনো তেলচিটে বালিয়ে চিবুক রেখে উপুড় হয়ে দেখছে গাঙের জলটলমল রূপ, কখনো দেখছে গাঙপারে সবুজ বনের ধূসর ছায়া।

সুন্দরবনের আবাদ অঞ্চলের ছেলে চন্দন। সুন্দরবনের গহন অরণ্যের কথা তার জানা। বার কয়েক এসেছেও জঙ্গলের মধ্যে। তবে এমন করে কোনদিন জঙ্গলের রাজ্যে যায়নি।

বাবার কাছে জঙ্গলের গল্প শুনেছে সে। কত গল্প। সে সব গল্প শুনে কখনো শিউরে উঠেছে, কখনো রোমাঞ্চিত হয়েছে, কিন্তু ভয় পায়নি কখনো। বরং ভেবেছে, সে বড় হয়ে যাবে ওই জঙ্গলের রাজ্যে। দেখবে কী আছে জঙ্গলে।



অপলক চোখে চেয়ে থাকে চন্দন গাঙপারের গভীর জঙ্গলের দিকে। মনে মনে ভাবে, না জানি ওই জঙ্গলের রাজ্যটা কত সুন্দর!

ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে চন্দন...

শেষরাতে আবার ভরাজোয়ারের শেষে ভাঁটার টান লাগলো রায়মঙ্গলে।

ঘুম ভেঙে গেছে ডিঙির মানুষদের। ভাঁটার টান লাগতেই আবার ডিঙি ভাসিয়েছে জলে।
ডিঙির ছইয়ে ঠেস দিয়ে বসে আছে চন্দন। শেষ রাতের ঈষৎ ঠান্ডা বাতাসের ছোঁয়াটা বড়
মিষ্টি লাগছে। এ বাতাস আসছে দক্ষিণ সমুদ্র হতে।

সমুদ্র চোখে দেখেনি চন্দন। কিন্তু সমুদ্রের কথা সে শুনেছে বাবার কাছে। বাবা জীবনে
অনেক বার সমুদ্র দেখেছে। যা কেউ পারেনি তা-ই পেরেছিল কদম ঢালি। ছোট পানসি নিয়ে
একবার হেড়োডাঙা দিয়ে সপ্তমুখীর মোহনায় সাগরে গিয়েছিল।

চন্দনেরও ইচ্ছে হয়, সেও যাবে সমুদ্রে। বাবার শখের পানসিটা এখনো খালপারে তোলা
আছে। ওটাকে ঠিকমতো মেরামত করে নিলে আবার জলে ভাসানো যায়।

মনে মনে ঠিক করলো চন্দন, এবারে বাড়ি ফিরে তার প্রথম কাজ হবে পানসিটাকে
মেরামত করে জলে ভাসানো। তারপর অন্য কাজ।

চুপচাপ বসে নানা কথা ভাবছিল চন্দন। ধন্য বাউলির ডাকে তার চমক ভাঙে।

অ্যাই, কী ভাবিস রে তুই?

চন্দন ফিরে তাকায় বাউলির মুখের দিকে।

বাউলি তার পিঠে মৃদু চাপড় মেরে বলে, ভাবিস নে। বাদায় যাচ্ছিস, মনের মধ্যে এখন
কোন ভাবনা রাখতি নেই। ওই দ্যাখ্ পূবের দিকে চেয়ে।

পূবের আকাশের দিকে ফিরে চায় চন্দন। কে যেন একরাশ আবির ছড়িয়ে দিয়েছে নীল
আকাশের গায়ে। মুগ্ধ হয়ে যায় চন্দন। এমন করে সূর্য উঠতে কখনো দেখেনি সে।

সূর্য উঠলো। ঝলমল করে উঠলো জল-জঙ্গলের রাজ্যটা।

চৈত্ররাতের শিশির পড়েছে সবুজ বনের পাতায় পাতায়। শিশিরবিন্দুর ওপর নবীন সূর্যালোক।
মনে হচ্ছে, যেন অসংখ্য মুক্তো ফুটে রয়েছে। দূরন্ত রায়মঙ্গল ছুটছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। নদীর
এপারে অরণ্য, ওপারে অরণ্য। অরণ্য এখানে নিবিড়, সবুজ। বনের পাখিরা ডানা মেলছে
আকাশে। সাদা বকগুলো দল বেঁধে বসে আছে নদীর পায়ে গাছের ডালে-ডালে। হঠাৎ মনে হয়,
যেন সাদা ফুল ফুটে রয়েছে অজস্র।

শীতের শেষে পুরনো পাতা গেছে ঝরে। গাছে গাছে নতুন পাতার সমারোহ। সূর্যের আলোয়
হালকা সবুজ রঙ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

এই সুন্দর অরণ্যের মধ্যে রয়েছে হিংস্র শ্বাপদ আর বিষাক্ত মরীচ। এই অঞ্চলের নদী-
নালায় রয়েছে ভয়ংকর কুমির-হাঙর-কামটের দল।

চন্দন অবাকচোখে চেয়ে আছে জঙ্গলের দিকে। হঠাৎ তার চোখ পড়লো নদীর ধারে একটি
চরের দিকে। দেখলো, একদল হরিণ চকিত দৃষ্টিতে নদীর পারে দাঁড়িয়ে চেয়ে আছে তাদের

ডিঙির দিকে।

কী সুন্দর ওই হরিণগুলো! কী সুন্দর ওদের দুটি চোখ!

তরতরিয়ে ভেসে চলেছে ডিঙি উত্তর থেকে দক্ষিণে। আরো দু ভাঁটার পথ পেরিয়ে কালিচকের বাদা, যেখানে গেঁয়ো, কেওড়া, গরান, পিটুলি গাছের বাদা মৌ-এর গন্ধে ভরে আছে। এ ছাড়া আরো কত অজানা গাছ সেখানে।

ধন্য বাউলির দল চলেছে।

রায়মঙ্গল ধরে তাদের পথ। ভাঁটার টানে ডিঙি চলেছে ভেসে।

নদীর এপারে-ওপারে গভীর জঙ্গল। নদীর পারে হেঁতালের ঘন ঝোপগুলো বড় সুন্দর। আর গোলপাতার সমারোহ যেখানে, সেখানে কেমন যেন ভয়ংকর অন্ধকার জড়িয়ে আছে।

মাঝে মাঝে ছোট-বড় খাড়ি। জোয়ারের সময় খাড়িগুলো জলে ভরে যায়। উপচে ওঠে সে জল। খাড়ি ছাপিয়ে জল জঙ্গলের মধ্যেও ঢোকে।

ভাঁটার টানে আবার জল নেমে যায়। খাড়ির জল এসে পড়ে গাঙে। কিন্তু একেবারে শুকিয়ে যায় কিছু কিছু খাড়ি।

মৎস্য-শিকারীরা ভিড় করে এই খাড়িগুলোর মুখে। ছয় ঋতু বারো মাসই এখানে মাছ ধরার মরশুম। জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জেলে-মালোরা আসে মাছ ধরতে। সেইসব মাছ চালান যায় হাসনাবাদ, ক্যানিং কিংবা ডায়মন্ডহারবার হয়ে কলকাতায়।

খাড়ির মুখে জাল পাতা। জেলেডিঙি বাঁধা রয়েছে। জল নেমে যাবার পর জাল টেনে তুলবে, জালে উঠবে রূপোলি মাছ। ভেটকি, পার্শে, ডাঙান, আরো কত রকমের ছোট-বড় মাছ!

একটা খাড়ির মুখে জাল টেনে তুলছে জেলেরা। ধন্য বাউলি হাঁক পাড়ে, কি গো ভাই, মাছটাছ পাওয়া যাবে নাকি?

জেলেডিঙি থেকে উত্তর আসে—যাবে বৈকি।

ডিঙি নিয়ে ধন্য বাউলি চলে খাড়ির মুখে।

জাল তুলেছে জেলেরা। নানা জাতের মাছ। ধন্য বাউলি পছন্দসই দুটো ভেটকি মাছ নেয়। ক জন মানুষের দু বেলার খাওয়া হয়ে যাবে।

পিছনের ডিঙিতে বসে আছে শশী। রান্নাবান্না সে-ই করে। ধন্য বাউলি বলে, শশী, আলু দে মাছের ঝোল রাঁধবি, বুঝলি?

শশী বলে, আমি যে ডাল চাপায়ে দিছি।

ধন্য বলে, চাপায়ে যখন দিছিস, মুড়ো দুটো ভেজে ডাল ফেলে দে। মুড়োর ঘন্ট অনেকদিন জুত করে খাইনি।

ডিঙির মানুষেরা নানা কথায় হাসি-ঠাট্টায় মুখর। তার মধ্যে চন্দন আশ্চর্য রকমের স্থির, তার দু চোখ কখনো নদীর এপারে, কখনো ওপারে বাদার দিকে। আর তার মনে এক চিন্তা। আরো দু ভাঁটার পথ পেরিয়ে কখন ওরা পৌঁছবে কালিচকের জঙ্গলে?

সেদিন গেল, রাত গেল, পরদিন ভোর হবার মুখে ধন্য বাউলির দল ডিঙি বাঁধলো কালিচকের জঙ্গলের পারে।

রায়মঙ্গল এখানে দূরন্ত বিশাল।-এপার থেকে ওপার স্পষ্ট দেখা যায় না।

ঝড় নেই, সামান্য বাতাস বইছে, তাতেই রায়মঙ্গল উথালপাথাল। ডিঙিগুলো ওঠানামা করছে ঢেউয়ের তালে তালে।

তিনটি ডিঙি পাশাপাশি বাঁধলো। ভাঁটার টানে তখন জল নেমে গেছে অনেকখানি নিচে। ডিঙির সওয়ারিরা যারা ঘুমোচ্ছিল তারা গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে। ধন্য বাউলির পাশে দাঁড়িয়ে চন্দন দেখছে জঙ্গল। নিস্তরু নিথর গহন অরণ্য যেন ভ্রুকুটি করে চেয়ে আছে।

পাশেই একটা খাড়ি। খাড়ির জল ভাঁটার টানে নেমে আসছে গাঙে। অগুনতি তিনচোখো মাছ খেলে বেড়াচ্ছে নরম পলির ওপর। কয়েকটা ছোট-বড় কাঁকড়া চরে বেড়াচ্ছে। কাদাখোঁচা পাখিরা কী সব পোকা-মাকড় খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে।

চন্দন অবাকচোখে চেয়ে আছে জঙ্গলরাজ্যের দিকে। বিস্ময় তার চোখে মুখে যেন দানা বেঁধে আছে। কেওড়া গাছের ডালগুলো নুয়ে পড়েছে। থোকা থোকা ফুল ফুটে আছে কেওড়ার ডালে ডালে। ফলও ধরেছে দু একটা বৃন্তে।

কাংড়া গাছের পাতাগুলো ভারি সুন্দর দেখতে। টানা টানা চোখের মতো। পাতাগুলোয় হলুদ-সবুজ মেশানো। পাতার কিনারায় লাল রঙের শিরা। ওড়া, গরান, পিটুলি, ওড়াচাকা ছাড়াও আরো কত রকমের গাছ! কাঠশোলার গাছগুলো ঘন হয়ে আছে এক-এক জায়গায়।

নদীর কিনারা বরাবর 'শূলো' গজিয়ে আছে। শূলোগুলো আসলে কাঠশোলা গাছের শিকড়। শূলোগুলোর মুখ ছুঁচের মতো। মানুষ হোক, জীব-জন্তু হোক, শূলোর ওপর চলতে ভয় পায়—যদি পায় বিঁধে যায়। বাঘেরাও ভয় পায় শূলোর ওপর চলতে। দেখে দেখে পা না ফেললেই শূলো বিঁধে যাবে। কিন্তু হরিণেরা তেমন ভয় পায় না শূলোকে।

চন্দনের হঠাৎ চমক ভাঙে অদূরেই একটা গাছের ডালে এক পাখির কিচিরমিচির করে উঠতে। ধন্য বাউলির নাসারন্ধ্র স্ফীত হয়ে ওঠে, উইঁ, লক্ষণটা ভুলে নয়। পরক্ষণে দেখা যায়, একঝাঁক পাখি ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। আর তার ঋষিমূর্তে দেখা গেল, গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একদল হরিণ উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছে।

ধন্য বাউলির চোখ তখন অরণ্যের অন্ধকারের দিকে। কিন্তু আর কিছুই দেখা গেল না।

চন্দন স্থির দাঁড়িয়ে ছিল। ধন্য বাউলি তার কাঁধে হাত রাখে কি রে, ভয় লাগছে?

চন্দন ছোট্ট কথায় জবাব দেয়, না।

কিন্তু ডিঙির আর-আর মানুষেরা? যদিও রক্তে তাদের জঙ্গলে যাওয়ার নেশা, তবু সবার মনেই কিছুটা আতঙ্কের ছায়া। ডিঙি বাঁধার সঙ্গে সঙ্গে এমন অশুভ লক্ষণ ভালো নয়। বানরের চিৎকার, পাখির উড়ে যাওয়া, হরিণদলের ছুটে পালানো—নিশ্চয়ই জঙ্গলের ‘বড় কর্তা’ এদিকে এসেছে।

ডিঙি থেকে যত দূর চোখ পড়ে জঙ্গলের তলদেশে কেমন যেন রহস্যময় অন্ধকার। কোথাও অন্ধকার এত নিবিড় যে, সূর্যের আলো পর্যন্ত পৌঁছয় না।

ধন্য বাউলি পুরনো মানুষ। সুন্দরবনের সঙ্গে তার অনেক দিনের সম্পর্ক। অরণ্যের কোথায় কি আছে তার নখ-দর্পণে। দলের মধ্যে আরো অনেকে বারবার এসেছে মধু-সংগ্রহে। এবারে কজন নতুন লোক এসেছে। চন্দন তাদেরই একজন।

যদিও এদের সবার মনেই চাপা উত্তেজনা, শিহরণ, ভয়, তবু মনের মধ্যে মৌ চাক ভাঙার নেশা।

অরণ্যের গভীরে যেখানে মৌ-এর সুবাসে বাতাস উতলা, সেখানে যাবে ওরা। সংগ্রহ করবে মৌচাক। তারপর সেই মৌচাক থেকে মধু আর মোম।

বেশ কয়েকটা দিন তাদের কেটে যাবে এই জল-জঙ্গলের রাজ্যে, তারপর আবার বিজয়ী বীরের মতো ফিরে যাবে ঠিকানায়।

এখানে এরা সবাই যেন সৈনিক।

অরণ্যের গভীরে ওদের প্রতিটি পদক্ষেপ সতর্ক। একটু যদি অসতর্ক হয়, তাহলে মুহূর্তে চরম বিপদ দেখা দিতে পারে। হাতের মুঠোয় জীবন নিয়ে চলতে হয়। এখানে চারদিকে ওত পেতে রয়েছে ভয়ংকর বিভীষিকা।

সেদিনটা গেল। পরদিন সকালে এক ধন্য বাউলি ছাড়া কেউই পারে নামলো না। একটা হালকা বাঁশের টুকরোর ডগায় লাল কাপড়ের নিসান উড়িয়ে ধন্য বাউলি ছাড়া গেল বাদার গভীরে। কোথায় গেল সে-ই জানে, ফিরে এলো বেশ কিছু সময় বাদে।

সবাই ফিরে চাইলো ধন্য বাউলির মুখের দিকে। ধন্য বাউলি ডিঙিতে উঠে বললে, এবারে অনেক মধু পারো। বনবিবির যদি কিররপা থাকে, তাহলে দেখবি মধুর কেঁড়ে সব ভরে উঠবে।

আনন্দে ভরে উঠলো সবার মন।

চন্দন জিজ্ঞাসা করলে, কখন বাদায় যাবো বাউলি? বাউলি বললে, আজ নয় রে, কাল। নে, এবারে বোস্ সবাই, বাদাবনের গল্প শোন্।

জীবনের নানা অভিজ্ঞতার কথা শোনাতে লাগলো ধন্য বাউলি। বিচিত্র সে গল্প। গল্প নয়-সত্যি কাহিনী। নানা ধরনের রোমহর্ষক গল্প শোনাযায় বাউলি। সবাই অবাক হয়ে শোনে।

দিনের বাকি সময়টুকু গেল। সন্ধ্যার সময় চোখ-ধাঁধানো আলো এসে পড়লো দূরে একটা খাঁড়ির মুখ থেকে। তারপরেই শোনা গেল স্পীডবোটের যান্ত্রিক আওয়াজ।

জঙ্গল অফিসের স্পীডবোট এলো। ধন্য বাউলি চেনা মানুষ ‘জঙ্গলবাবু’র। তবু ‘ছাড়’ দেখতে চাইলেন।

বেআইনি কাজ করে না ধন্য বাউলি। সবারই জঙ্গলে যাবার পাশ আছে। তবু চন্দনকে দেখে জঙ্গলবাবু বললেন, এইটুকু ছেলেকে নিয়ে যাওয়া ঠিক নয়।

স্পীডবোট নিয়ে চলে গেলেন জঙ্গলবাবু এবং তাঁর সঙ্গে লোকজন।

সন্ধ্যা নামালো জল-জঙ্গলের দেশে। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে চারদিকের পরিবেশ আর পটভূমিকার চেহারা যেন বদলে গেল। অন্ধকারের একটা ভারী পর্দা পড়ল গহন অরণ্যে আর গাঙের জলে। নিথর হয়ে এলো জল-জঙ্গল। আকাশে ফুটলো অজস্র তারা, উঁকি দিল কাস্তুর মতো একফালি চাঁদ।

দলের মধ্যে শ্রীদাম আর গুপীর গানের গলা আছে। শ্রীদাম তো অনেক দিন কৃষ্ণযাত্রার দলে ছিল। দলে সে-ই সাজতো কৃষ্ণ।

শ্রীদাম গান ধরলো। সঙ্গে কণ্ঠ মেলালো গুপী। আনন্দে মেতে উঠলো ডিঙির মানুষেরা।

গভীর রাত পর্যন্ত গান-বাজনা চললো। তারপর খাওয়াদাওয়ার পালা চুকিয়ে যে যার মতো শুয়ে পড়লো। জেগে রইলো দুজন। তাদের চোখ জঙ্গলের দিকে, যে কোন সময় বিপদ আসতে পারে বাদার দিক থেকে।

পালা করে রাত জাগতে হবে। যারা এখন জাগছে, তারা ঘন্টা দুই বাদে ঘুমোবে, তারপর আবার দুজন জাগবে। রাত ভোর না হওয়া পর্যন্ত এই ব্যবস্থা।

মাঝরাতে ডাক পড়লো চন্দনের। ঘুমভাঙা চোখে নোনা জলের ঝাপটা দিলে সে। তারপর ছই ঠেস দিয়ে বসলো।

এখন সে পাহারাদার। এখন সে যেন এক অপার বিস্ময়ের সমুদ্রে হারিয়ে গেছে। মাথার ওপর আকাশ, অজস্র চুমকির মতো সেখানে তারারা জ্বলছে, নিচে উথালিপাথালি করছে রায়মঙ্গল, আর তার এপারে-ওপারে গহন বন—রহস্যময় সুন্দরবন।

মোহময় চোখে চন্দন যেন স্বপ্ন দেখছে।

পরদিন ধন্য বাউলির নির্দেশে মধু-সন্ধানীর দল পা ফেললো বাদায় মাটিতে। ডিঙিতে পাহারায় রইলো দু জন বাকি সবাই চললো জঙ্গলে।

সন্তর্পণে পা ফেলে এগুতে হচ্ছে। ভয়ংকর শূলোগুলো এড়িয়ে চলতে হচ্ছে। কিছু দূর এগিয়ে যাবার পর শূলোর ভয় থেকে মুক্তি পাওয়া গেল।

ধন্য বাউলি চলেছে আগে আগে। পিছনে তার দলবল। চন্দন বার বার পিছিয়ে পড়ছে, দৃষ্টি তার বার বার চারিদিকের অপরূপ দৃশ্যপট দেখতে চাইছে।

মানুষের সাড়া পেয়ে বানরের দল কিচিরমিচির শুরু করে দিয়েছে। পাখিরা নিশ্চিত্তে বিশ্রাম করছিল গাছের ডালে, তারাও চঞ্চল হয়ে উঠেছে। এক-একটা বনমোরগ ডানা ঝাপটিয়ে গাছের মগডালে চেপে বসছে।

যতই তারা এগিয়ে চলেছে, বন তত নিবিড় হচ্ছে। বনের চেহারাও হয়ে উঠেছে ভয়ংকর। আকাশে জ্বলছে সূর্য, অথচ নীচে ছায়া-ছায়া অন্ধকার।

মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়ায় পথ-প্রদর্শক ধন্য বাউলি। এদিক ওদিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে। আবার চলছে। চলতে চলতে কখনো দিক পরিবর্তন করছে।

অজস্র রকমের গাছ—গরান, ওড়া, পিটুলি, ওড়চাকা। কোথাও হে তাল গোলপাতার ঝোপ, আবার কোথাও কেওড়া ও কাড়া গাছের সমারোহ।

গাছে গাছে ফুল ধরেছে। সে ফুলের মিষ্টি বন্য গন্ধ আশপাশের বাতাসকে মাতাল করে তুলছে। কিন্তু কোথায় মৌচাক! কোথায় তাদের মধুর ভান্ডার!

আচমকা থমকে দাঁড়ালো সবাই। সামনেই একটা খাড়ি। সোজা যাবার উপায় নেই।

খাড়ির পাড় বরাবর চলতে লাগলো ধন্য বাউলির দল। এবারের পথ পূর্ব দিকে।

জঙ্গল ক্রমশ গভীরতর হচ্ছে। আরো সতর্ক হয়ে চলছে সবাই।

এ সব জঙ্গলের চরিত্র ধন্য বাউলির জানা। খাড়ির পারে পারে এই হেতাল আর গোলপাতার ঝোপ, এখানেই ‘বড় কর্তা’র আড্ডা।

হাওয়ার বিপরীতে চলতে চলতে হয় মধু-সন্ধানীদের। তাতে নাকি অনেক সুবিধে। আর কান রাখতে হয় বানরের ‘কু’ ধ্বনির জন্যে। বানর ‘কু’ দিলেই বুঝতে হবে, বড় কর্তার আধিভাব আসন্ন।

কিন্তু এখনো তেমন ঘটনা ঘটেনি।

আরো এগিয়ে এলো ওরা অরণ্যের আরো গভীরে। ধন্য বাউলি এদিক ওদিক দেখছে। কি ভাবছে যেন।

খানিক দাঁড়িয়ে থেকে ধন্য বাউলি বলে ওঠে, চলো ফিরে, আজ আর যাবো না।

জঙ্গলের অনেক দূর এসেছিল ওরা। ডিঙিতে ফিরলো যখন, তখন ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামছে জল জঙ্গলের দেশে।

সে রাতও গেল।

পরদিন সকালের ভাঁটায় ধন্য বাউলির নির্দেশে ডিঙি ভাসলো আবার।

দক্ষিণে কিছু পথ আসার পর একটা চওড়া খাড়ি।

এবারে সেই খাড়িপথেই ঢুকতে হবে। সুতরাং জোয়ারের অপেক্ষায় বসে থাকতে হবে। জোয়ারের জল খাড়িতে না ঢোকা পর্যন্ত ডিঙি চলবে না। এখন জল নেই বললেই চলে।

জোয়ার এলো গাঙে। জোয়ারের জল ঢুকতে লাগলো খাড়িতে। সেই জোয়ারে খাড়িপথেই ডিঙি চললো ভেসে।

খাড়িপথে চলতে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয় পারের দিকে। যে কোনো মুহূর্তে বিপদ আসতে পারে।

খাড়ির ওপর এসে পড়েছে গাছের ডাল পালা। পারে জলের কিনারা বরাবর গোলপাতা আর হে তালের ঝোপ। মাঝে মাঝে গোল গাছ। গোল গাছের পাতা অনেক কাজে লাগে। গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষ গোল পাতার ছাউনি দেয়া ঘরে বাস করে।

গুপী হঠাৎ চাপা চিৎকার করে ওঠে। পাশেই কেওড়া গাছের ডালে পাক দিয়ে জড়িয়ে আছে ভয়ংকর একটা সাপ। মিশকালো। ফণাটা দুলছে।

এসব সাপ কেউটে জাতীয়। ওরা লাফিয়ে পড়তে পারে ডিঙিতে। মুখ ঘুরিয়ে পাশ কাটিয়ে চললো ডিঙি।

চন্দন কিন্তু মুগ্ধ চোখে জঙ্গলের সৌন্দর্যটাই দেখছে। নিবিড় সবুজ অরণ্য। কত রকমের গাছপালা। কত রকমের পাখি প্রজাপতি আর কেওড়ার ডালে বসা বানরের দল। সবচেয়ে সুন্দর লাগে শাদা বকগুলো যখন দল বেঁধে গাছের ডালে বসে থাকে।

খাড়িপথ দিয়ে ডিঙি চলেছে। এ সব জায়গায় মানুষের যাতায়াত নিতান্তই নগণ্য। মানুষের সাড়া পেয়ে বানরেরা কিচিরমিচির করে উঠেছে, পাখিরা ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে যাচ্ছে। গুপীও বোধহয় প্রতিবাদ করছে। আমাদের রাজ্যে তোমরা কেন এসেছো?

সহসা চন্দনের দু চোখের সামনে যেন বিশ্বয়ের দরজা খুলে যায়। চারদিকে গভীর জঙ্গল, তারই মধ্যে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। লম্বা ঘাস ছাড়া সেখানে এখনো কিছু গাছপালা জন্মায় নি। একদল হরিণ ঘাসে ঢাকা প্রান্তরে কচি কচি ঘাস খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে।

তিন-তিনটে ডিঙিকে খাড়িপথে আসতে দেখে অস্তু হরিণের দল ভয়-চকিত দৃষ্টিতে ফিরে তাকায়, তারপর আচমকা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালায় অরণ্যের গভীরে....।

বেশ কিছুদূর আসার পর ধন্য বাউলি বলে, ডিঙি বাঁধো। এখানেই আমাদের নামতে হবে। যে কথা সেই কাজ?



তিনটে ডিঙি পাশাপাশি বাঁধা হলো। খাড়ির দুদিক থেকে কেওড়ার ডাল এসে পড়েছে।
জায়গাটা কতকটা কুঞ্জবনের মতো।

দুদিকে কালো-কশাড় জঙ্গল। এই জঙ্গলের গভীরে হয়তো পাওয়া যাবে মৌমাছির মধুর
ভান্ডার।

কিন্তু আজই ওরা জঙ্গলেই নামছে না। আজকের দিনটা ডিঙিতে বিশ্রাম।

সারাদিন গেল। সন্ধ্যা নামলো অরণ্যদেশে। নামলো অন্ধকার। যদিও আকাশে ফালি চাঁদ,
তবু তার আলো এসে পৌঁছয় না এখানে। মাথার ওপরে ঘন ডালপালার ফাঁক দিয়ে একটুকরো



আকাশ চোখে পড়ে।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার আরো গভীর হলো। নিকষকালো অন্ধকার। ডিঙির মানুষের অনেকেই ঘুমিয়ে। জনতিনেক রাত জেগে পাহারা দিচ্ছে। জায়া মানুষগুলোর হাতের কাছে ধারালো বল্লম আর কোঁচ। যদি বিপদ আসে, তারই মোকাবিলা করার জন্যে এগুলো।

চন্দনকে যদিও ঘুমোতে বলেছিল ধন্য বাউলি, কিন্তু ঘুম নেই চন্দনের চোখে।

নিশুতি রাত। অরণ্যরাজ্য জুড়ে বিচিত্র নিশুত্বতা। শুধু মাঝে মাঝে এক-একটা পাখির ডাক

রাতের গভীর নীরবতা ভেঙে দিচ্ছে।

চন্দনের কিসের গন্ধ নাকে এলো। চন্দন, শশী গুপী, শ্রীদাম, নড়েচড়ে বসলো। দশাসই চেহারার ধন্য বাউলি ঘুমিয়ে ঠিল, শশী তাকে ডাকলো চুপিসাড়ে।

তড়াক করে উঠে বসলো ধন্য বাউলি। ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিতে লাগলো। হ্যাঁ, গন্ধ আসছে বটে!

হে তালঝোপের দিকে দৃষ্টি ছিল চন্দনের। ঝোপের মধ্যে সুড়ঙ্গের মতো একটা জায়গা। সুড়ঙ্গের মধ্যে যেন পাশাপাশি দুটি আলোর বিন্দু জলছে।

বাউলির চোখ গেল সেদিকে। বাউলির সাহসী চোখদুটো জলে উঠলো। হাতের কাছে ছিল পাঁচ ব্যাটারির টর্চ। টর্চটা ফেলতে স্প্যাট হলো অন্ধকারের রহস্য।

তালঝোপের আড়ালে সুড়ঙ্গের মতো জায়গাটায় ওত পেতে আছে একটি রাজা বাঘ।

একটি মুহূর্তের ভগ্নাংশ মাত্র। চকিতে অন্ধকারে হারিয়ে গেল বাঘটা।

সঙ্গে সঙ্গে অরণ্য মুখর হলো। বানরেরা ‘কু’ দিতে লাগলো। পাখিরা ডানা ঝটপট করে ডাকলো। নিরীহ জন্তু-জানোয়ারেরা নিরাপদ আশ্রয়ে ছুটে পালাতে লাগলো। ধন্য বাউলির হাতের টর্চটা তখন চক্রাকারে ঘুরছে। উজ্জ্বল আলোর বৃত্তে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অরণ্যের বিভীষিকা।

পরদিন বাদাবনের গভীরে চললো ধন্য বাউলির দল। তন্ন তন্ন করে সন্ধান করলো মৌচাকের।

অবশেষে সন্ধান মিললো মধুর ভান্ডারের। গাছে গাছে মৌমাছিদের সঞ্চয়—মধুর ভান্ডার।

মৌ-মৌ গন্ধে এ এলাকার বাতাস উতলা।

মধু-সন্ধানীদের লোভী দৃষ্টি আনন্দে নেচে উঠলো। অনেক মধু, অনেক টাকা। এত মধু সাত দিনেও সংগ্রহ করা যাবে না।

কিন্তু চন্দন ভাবছে অন্য কথা। অরণ্যের মৌমাছি, এটা তাদের জগৎ। ফুল থেকে কত যত্নে তারা তিল তিল মধু সংগ্রহ করে সঞ্চয় করেছে তাদের ভান্ডারে, সে কেন চুরি করে নেবে তাদের সঞ্চয়?

ধন্য লক্ষ্য করে উন্মনা চন্দনকে। বলে, কিরে, কি ভাবিস?

চন্দন উত্তর দেয় না। চুপ করে থাকে।

ভয় পাস বুঝি? ধন্য জিজ্ঞাসা করে।

চন্দনের পেশী শক্ত হয়ে ওঠে। মাথা উঁচু করে বলে, ভয় কি? আমি জানি নে।

এই তো মরদের মতন কথা ধন্য বলে, তোর বাপ ছিল জঙ্গলের দুষমন। বাপের নাম রাখতি হবে তোকে। পারবি তো?

বাবার কথা মনে পড়তেই চন্দনের রক্তে যেন আগুন ধরে যায়। তার বাবার মতো সাহসী

কেউ ছিল না এ তল্লাটে। বাঘের সঙ্গে একা লড়াই করেছে। শেষ পর্যন্ত মানুষটার প্রাণ যায় বাঘেরই হাতে।

চন্দনের মনে আছে, ক বছর আগে এমনি মৌ-ভাঙার মরশুমে তার বাবাও এসেছিল। সে বারে আর ফিরে যায়নি মানুষটা। দলের লোকেরা রক্তমাখা খানিকটা হাড়গোড় আর মাংসের গলা নিয়ে গিয়েছিল গাঁয়ে।

যদিও বাবার কথা মনে পড়তে তার মনটা কেঁদে ওঠে, তবু রক্তে যেন আগুন জ্বলে ওঠে। দেখতে দেখতে তার কচি কোমল মুখখানা ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে, ইম্পাতের মতো কঠিন হয়ে ওঠে তার পেশীগুলো। আগুনজ্বলা চোখে ফিরে চায় সে ধন্য বাউলির মুখের দিকে।

ধন্য বাউলির মনে পড়ে কদম ঢালির কথা। সেও মাঝে মাঝে এমনি ভয়ংকর হয়ে উঠতো।

এক-একটা করে দিন যায়। মৌ-ভাঙার নেশায় মেতে ওঠে মানুষেরা। মৌমাছির সঞ্চয় করেছে ফুলের মধু। চাক তৈরি করেছে। মৌচাক। মধুর নেশায় মৌমাছির ফুলে ফুলে কত গুঞ্জন, কত গান গাওয়া। মৌচাক যে তাদের স্বপ্ন। তাদের সে স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে যায় মানুষেরই হাত।

শীত শেষ হয়। বসন্তে ফুল ফোটে সুন্দরবনের গহন অরণ্যে। মৌমাছির আসে, ফুলে ফুলে ঝিঁঝিঁ করে গান গেয়ে। তাদের ছোট্ট অবয়ব, ছোট ঠোঁট, তবু তিল তিল করে আহরণ করে ফুলের মধু। চাক রচনা করে গাছের ডালে। এক-কেটি মৌচাক এক-একটি দুর্গ। বিচিত্র-সুন্দর তার গঠনশৈলী, যেন নিপুণ শিল্পীর হাতের রচনা। কত দিনের আশা তাদের জমানো এইসব চাকে, কত দিনের পরিশ্রম! কিন্তু সব শেষ করে দিয়ে যায় মানুষ।

মৌ-ভাঙার নেশায় ধন্য বাউলির দল মেতে ওঠে। আরো মধু চাই, অনেক মধু।

বনের গভীরে ঘুরে বেড়ায় তারা। ভুলে যায় বিপদের কথা, ভুলে যায় সবকিছু একটা নেশার ঘোর তাদের ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায় অরণ্যের এখানে-ওখানে।

একদিন।

সন্ধ্যা হয়েছে। আকাশে ফুটেছে লক্ষ তারা। চাঁদ উঠেছে। মধুর জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে নিবিড় অরণ্যে।

আরো নতুন নতুন মৌচাকের সন্ধান পেয়েছে ধন্য বাউলির দল। এ চাক না ভেঙে আজ তারা ফিরবে না।

এ-এক বিচিত্র নেশা। সেই নেশায় পেয়ে বসেছে মানুষগুলোকে।

কিন্তু আচমকা হৃদ-পতন ঘটলো। দূর থেকে 'কু' দিয়ে উঠলো বানর। সঙ্গে সঙ্গে সচকিত

হয়ে উঠলো অরণ্যদেশ। বানরেরা মিলিত কণ্ঠে কু দিতে লাগলো। কুকো পাখিরা ডেকে উঠলো। দুটি হরিণ মানুষের দলের সামনে দিয়েই উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালালো।

চিৎকার করে উঠলো ধন্য বাউলি দুর্বোধ্য ভাষায়। দলের লোকেরা সতর্ক হলো। ডাঙা ক্যানেষ্টার ছিল গুপীর কাছে, পিটতে লাগলো সে। যে কটি মশাল জ্বালা হয়নি, সেগুলি জ্বলে উঠলো। দলের লোকেরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল, একান্তে ছিল চন্দন আর গুপী। চন্দন শক্ত হাতে বাগিয়ে ধরলো কোঁচ-ছ-সাত হাত বাঁশের ডগায় ইস্পাতের পাঁচটি ধারালো ফলা।

রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত। ধন্য বাউলির হাতের টর্চ ঘুরছে। উজ্জ্বল আলোয় গহন অরণ্য ঝলসে উঠছে যেন। দক্ষিণে হেতালের ঝোপ দুলে উঠলো। নিঃসঙ্গ শশী দাঁড়িয়ে আছে মশালহাতে—ভয়ংকর কালদূত গুটি গুটি এগিয়ে আসছে শশীর দিকে।

চন্দন দাঁড়িয়ে ছিল একান্তে। হুঙ্কার দিয়ে উঠলো। শক্ত দু হাতের মুঠোয় কোঁচ বাগিয়ে ধরে ছুটে গেল চন্দন। কালদূত শশীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই সে কোচ নিয়ে লাফিয়ে পড়লো হেতালের ঝোপের সামনে।

বিচিত্র এই বাঘের চরিত্র। মুখোমুখি দাঁড়ালে সে থমকে দাঁড়াবেই তাকেও ভাবতে হবে এগোবে কিনা।

চন্দন কোঁচ বাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সামনাসামনি লাফ দিয়ে নিষ্কৃতি নেই বাঘটির, কোঁচের ওপর পড়তে হবেই।

মুহূর্তের ভগ্নাংশ। ধীরে ধীরে পিছু হঠতে লাগলো রাজা বাঘটি। কিন্তু রাজা বাঘের চোখে তখন আর হিংস্রতা নেই। সেও যেন বাঁচতে চাইছে। পিছু হঠাৎ মুহূর্তে তার দৃষ্টি বড় করুণ মনে হলো। তারপর লাফ দিয়ে পলকের মধ্যে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল রাজা বাঘ।

উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠলো চন্দন।

বিপদের মুখোমুখি হয়ে কদম ঢালিও এমনি করে হাসতো।

মৌ-ডাঙার নেশায় পাগল মানুষগুলো এতক্ষণে যেন সন্নিবিষ্ট ফিরে পেয়েছে শশী ঠকঠক করে কাঁপছে। আর-আর মানুষেরা এতক্ষণে ভাবতে পারছে যে, তারা বেঁচে আছে।

ধন্য বাউলি এসে দু হাতে জড়িয়ে ধরে চন্দনকে। চন্দনের দু চোখে তখন আগুন জ্বলছে। তার মনের পর্দায় এখন বাঘের করুণ চাউনি।

ধন্য বাউলির দল ফিরে চলেছে। এই ভাঁটাতেই তারা খাড়ি থেকে নেরে যাবে। এখানে আর একদিনও থাকা ঠিক নয়।

মধুর চাক নিয়ে মশালের আলোয় গভীর বনের মধ্যে দিয়ে দল বেঁধে ধন্য বাউলির দল এসে পৌছয় খাড়ির মুখে। সেখানে পাশাপাশি তিনটে ভিঙি বাঁধা।

ভরা জোয়ার এখন। খাড়ি ছাপিয়ে জল উঠেছে বনের মধ্যে। হাঁটুজল ভেঙে এক-এক করে দলের সবাই ডিঙিতে এসে ওঠে।

সবার শেষে ধন্য বাউলি ডিঙিতে উঠলো। বললে, নে, দাঁড় টেনে চল।

আর ভাঁটার টানের অপেক্ষা নয়, জোয়ারেই ডিঙি ভাসালো ওরা।

এবারের পথ ভাঁটায় নয়—জোয়ারে। দক্ষিণ থেকে উত্তরে যাবে ধন্য বাউলির দল। সেখানেই ওদের ঠিকানা।

রাত্রিশেষ।

সূর্য উঠেছে। বনের অন্ধকার মিলিয়ে যাচ্ছে। অরণ্যরাজ্য আবার মুখর হয়ে উঠেছে পাখির কলকাকলিতে। শেষচৈত্রের শিশির পড়েছে সবুজ অরণ্যে। প্রভাত-সূর্যের আলোয় সে শিশিরবিন্দু মুক্তোর মত ঝলমল করছে।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে চন্দন দেখছে সবুজ অরণ্যকে।

পাখিরা আকাশে ডানা মেলছে। বকের দল ফুলের মতো ফুটে আছে নদীপারের গাছে। চোখের সামনে কয়েকটি কাংড়া গাছ। কাংড়া গাছের পাতাগুলো ভারি সুন্দর। হরিণের চোখের মতো।

কাংড়া গাছের একটি পল্লব ভাঙতে গেল চন্দন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাঙলো না। ভাবলো, অকারণ কেন সে গাছটিকে ব্যথা দেবে। এখনই আর বনে যাওয়া নয়, বনে যেতে হবে কিছু সময় বিশ্রামের পর।

ডিঙির একান্তে চুপচাপ বসে চন্দন। যে এখন অন্য কথা ভাবছে।

চন্দন ভাবছে, মৌমাছিদের সুখের ঘর তারা ভেঙে দিয়েছে। যাযাবর মৌমাছিরা ঘর বেঁধেছিল, তাদের সে ঘর হারিয়ে গেছে। তারা ঘরছাড়া-অসহায়।

ব্যথার ভারী হয়ে ওঠে চন্দনের মন। চাপা নিঃশ্বাস ফেলে সে, ফিরে তাকায় সবুজ অরণ্যের দিকে।

চন্দনের সমব্যথী মন যেন বলতে চায়, আবার ফুল ফুটুক অরণ্যে। ফুলে ফুলে মধু সংগ্রহ করুক মৌমাছিরা। রচনা করুক মৌচাক। তখন যে আসে আসুক, মৌমাছিদের ঘর ভাঙতে চন্দন কখনো আসবে না।

জল-ডাকাতে মুখোমুখি

দুই বন্ধু। ইন্দর আর মকবুল। এ বন্ধুত্ব ওদের ছোটবেলা থেকে। এখন পরিণত কৈশোরে পৌঁছেছে ওরা, বন্ধুত্ব তেমনই অটুট আছে।

সুন্দরবনের বন-এলাকার কাছাকাছি ঘুমটি গ্রামে ওদের বাড়ি। দুজনেই স্কুলে পড়ে। একই ক্লাসে। আসছে বছর ওরা মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে।

দুই বন্ধুর মনে অদ্ভুত সাহস। শরীরেও বেশ শক্তি। দু'জনের মনেই রোমাঞ্চকর অভিযানের নেশা। ছুটি পেলেই ওরা দুই বন্ধু হালকা অথচ মজবুত ছোট ডিঙি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সুন্দরবনের গভীরে। এই জলজঙ্গলের দেশের নাড়ি-নক্ষত্র জানে ওরা। দু-চারদিন জঙ্গলের গভীরে কাটিয়ে আবার ফিরে আসে বাড়ি।

এবারও বড়দিনের ছুটিতে দুই বন্ধু কালিন্দীর জলে ডিঙি ভাসালো। উদ্দেশ্য দু'ভাটার পথ পেরিয়ে নেতি ধোপানির বাদাবন দেখে আসবে। হিসেব করে দেখেছে যাতায়াতে পাঁচ-ছয় দিন লেগে যাবে। ও দিকটায় এখনো ওদের যাওয়া হয়নি। শুনেছে ওদিকের বাদাবন নাকি ভয়ংকর। ওদিককার নদী, খাল, খাড়িতে হাওর, কামট, কুমিরেরা রয়েছে ঝাঁকে ঝাঁকে। আর বনের মধ্যে রাজা বাঘেরা তো আছেই।

ডিঙিটা ইন্দরের কাকার। পশুর কাঠের ছোট অথচ মজবুত ডিহি। ওরা যখনই বেরোয়, এই ডিঙিটা নিয়ে বেরোয়। তবে শিকারটিকারের নেশা ওদের নেই। বরং দুই বন্ধু পশু-পাখি শিকার করার বিরোধী।

ভোরে গাঙের জলে ভাটার টান লাগার সঙ্গে সঙ্গে দুই বন্ধু ডিঙি ভাসিয়েছে কালিন্দীর জলে। আট-দশ দিন যদিও থাকবে না, তবু সেই মতো খাবারদাবার নিয়েছে। মাটির ষড় বড় দুটি কোলা ভর্তি করে জলও নিয়েছে। যদিও অথৈ গাঙে পাড়ি দেওয়া, কিন্তু গাঙের জল মুখে দেওয়া যায় না। এতই নোনা। আর এই পথে যাওয়া-আসা করতে পানীয় জল খুবই তেঁই হয়। এক কোলা জলেই হয়তো আট-দশটা দিন চলে যেত, কিন্তু ওরা দু'কোলা জল নিয়েছে। কোনোরকমে একটা কোলা যদি ভেঙেটেঙে যায় এই ভেবে।

এ-সব অঞ্চলে যে কোনো সময় বিপদ আসতে পারে। তাই হাতিয়ার হিসাবে সঙ্গে নেয় দুটি ধারালো বল্লম আর এক জোড়া সুন্দরী গাছের ডালের লাঠি। তবে ওদের সবচেয়ে বড় ভরসা

মনের জোর। মনের জোরে সাহসে বুক বেঁধে ওরা মাঝে মাঝে বাদাবনের দেশটা ঘুরতে বেরোয়। কত সময় বিপদের মুখে পড়েছে, কিন্তু সে বিপদের মোকাবিলাও ওরা করেছে।

ভোরে বেরিয়েছে ওরা। এখন ঝিকাল। ডিঙিতে আলুসিদ্ধ আর ডালভাত রান্না করে খেয়ে ডিঙির পাটাতনে শুয়ে বিশ্রাম করছে। বনের মধ্যে ঢুকে যাওয়া একটা চওড়া খাড়ির মুখে অপেক্ষা করছে ওরা। ভাঁটার টান না লাগা অর্থাৎ অপেক্ষা করতে হবে। ভাঁটা লাগবে সন্ধ্যার মুখোমুখি সময়।

ঝাঁকড়া কেওড়া গাছের ডালের সঙ্গে কাছি দিয়ে বাঁধা ডিঙি। কেওড়া গাছে এক পাল বানর নিজেদের মধ্যে খেলায় মেতেছে। সাদা বক আর নানা জাতের পাখ-পাখালি এপারে-ওপারে গাছের ডালে ডালে। মকবুল আর ইন্দর দু'জনেই অবাক চোখে দেখেছে চারিদিকের পরিবেশ। মাঝে একপাল হরিণকেও ছুটতে দেখেছে ওরা।

শীতের সূর্য এখন পশ্চিম দিগন্তে। জোয়ারের কালও শেষ। এবারে ভাঁটার টান আরম্ভ। ডিঙির কাছি খুললো ওরা।

কালিন্দী দিয়ে আর নয়, এই নাম-না-জানা খাড়ির মধ্যে দিয়েই যাবে ওরা। একটু আগে পথেই যাচ্ছিল জেলে ডিঙির বহর। তারাই বলে দিয়েছে এই খাড়ি পথে গেলেই বড় গাঙে পড়বে। সেই পথেই নেতি ধোপানি। তারা যেমন পথের কথা বলে দিয়েছে, তেমনি বলে দিয়েছে ওই পথে বিপদ-আপদের কথা।

এখন ডিঙি চলছে খাড়ি পথে। মকবুল হাল ধরে বসে আছে। ডিঙি তরতরিয়ে ভেসে চলছে ভাঁটার টানে।

দেখতে দেখতে শীতের সূর্য অস্ত গেল। ভাঙা চাঁদ উঠলো আকাশের কোণে। বন দেশের এখন অন্য রূপ। শিশিরসিক্ত বন। চাঁদের আলোয় শিশিরবিন্দুগুলো মুক্তাবিন্দুর মতো চিকচিক করছে। মনে হয়, সাত রাজার মণিমুক্তা কেউ ছড়িয়ে দিয়েছে বনের রাজ্যে। মকবুল আর ইন্দর, দু'জনেই ভালবাসে প্রকৃতিকে। আর এই ভালবাসার টানেই তো ওরা নদীনালা, বাদাবনের দেশে আসে নানা ধরনের বিপদের ঝুঁকি নিয়েও।

ডিঙি খাড়ি পথে চলছে। দু-ধারে কশাড় জঙ্গল। যদিও আকাশে চাঁদ তবু সে আলো পৌঁছয় না বনের ভিতর। মাঝে মাঝে আলোর এক-একটি রেখা এসে পড়েছে বনের ভিতরে। সে আলোর রেখা যেন অন্ধকারকেই স্পষ্ট করছে।

ইন্দর আর মকবুল দু-জনেই মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছে আশ্চর্য্যক পরিবেশ। দু-জনের মনে একটাই ভাবনা, কি সুন্দর এই বাদাবনের দেশ। যেন একটা সুন্দর স্বপ্নের দেশ।

স্বপ্নের ঘোর কেটে গেল আচমকা। দূরে কিসের যেন আর্তনাদ। দু-জনেই এখন সচকিত ও উৎকর্ষ।

আবার ভেসে এলো আর্ত চিৎকার। কোনো জন্তু-জানোয়ারের চিৎকার নয়, এই আর্তচিৎকার মানুষের।

একটু আগেই যে ডিঙির বহর যাচ্ছিল, তারা সাবধান করে দিয়েছে, এদিকে নানা বিপদ আছে। জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ তো আছেই, কিন্তু তার চেয়ে বেশি ভয় জল-ডাকাতদের। এদিকে খাড়ি পথে যারা মাছ মারতে যায়, যারা কাঠ কাটতে যায়—তাদের ওপর ডাকাতদের হামলার কথা প্রায়ই শোনা যায়।

দুই বন্ধুই সাহসী। ভয় কী তা ওরা জানে না। আর্তচিৎকার সমানে ভেসে আসছে। মকবুল শক্ত হাতে দাঁড় টানছে। তরতরিয়ে ভেসে চলেছে হালকা ডিঙি। যদিকে ওদের ডিঙি ভেসে চলেছে সেই দিক থেকেই আসছে চিৎকার।

দুটি ধারালো বল্লম ওদের কাছে। ইন্দর বল্লম দুটি ডিঙির খোল থেকে বার করে পাটাতনের ওপর রাখলো। পাঁচ ব্যাটারির টর্চটি ইন্দর হাতেই রেখেছে।

মকবুল একভাবে দাঁড় টেনে চলেছে। এই শীতের মধ্যেও ওর সর্বাস্থে ঘাম। মনের মধ্যে টান টান উত্তেজনা। কিন্তু বাইরে তার প্রকাশ নেই।

এদিকে ফিকে কুয়াশাও জমেছে। দূরের সব কিছু আবছা। খাড়ি বাঁক নিয়েছে। একটা শাখা খাঁড়িও দেখা গেল। জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেছে।

বাঁকের মুখে এসে ওরা দেখতে পেল একটা ছিপ নৌকা ছপাছপ দাঁড় টেনে তীব্র গতিতে সরু খাঁড়ির মধ্যে ঢুকছে। আর সামনের দিক থেকে নতুন করে আর্তচিৎকার আর কলরব ভেসে আসছে।

মকবুল প্রথমে সরু খাড়ির মুখে টর্চ ফেললো। দেখলো ছিপ নৌকোটা কিছুটা ভিতরে ঢুকছে। আরো দেখলো জঙ্গলের গাছপালা খাড়ির ওপর এমনভাবে ঝুঁকে পড়েছে, তাতে খাড়িটা সুড়ঙ্গের মতো মনে হচ্ছে।

তাড়াতাড়ি ডিঙির মুখ ঘোরালো ইন্দর। বললে, মকবুল, নিশ্চয়ই ওরা গাঙদেশের দিকে চলেছে।

মকবুল বললে, দ্যাখ ইন্দর, ওদের কাছে বন্দুক-টন্দুক থাকতে পারে।

ইন্দর বললে, তাই বলে ভয় পেয়ে পেছিয়ে যাব। তা হয় না।

যা ভাবা তাই। সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের গুলির আওয়াজ। কিন্তু ব্যর্থ নিশানা। গুলি ছুটে গেল পাশ দিয়ে। ইন্দর তড়িঘড়ি পাটাতনের তক্তা তুলে ঢালের মতো সামনে ধরলো। আর এক হাতে টর্চটা জ্বলে আলোটা এলোপাতাড়ি ঘোরাতে লাগলো। এদিকে মকবুল সমানে দাঁড় টেনে চলেছে।

দেখতে দেখতে দুই বন্ধুর ডিঙি এসে লাগলো ছিপ নৌকোর গায়ে। ছিপ নৌকোটা দুলে উঠলো। ইন্দর সেই মুহূর্তে তক্তার পাটাতন হাতে লাফিয়ে পড়লো ছিপ নৌকোর ওপরে।

দুশমনরা বুঝতে পারেনি এটা। ছিপ নৌকোটা এলোপাতাড়ি দোলাতে আরম্ভ করলো

ইন্দর। ছিপ নৌকোর সওয়ারিরা কেউ কিছু করার অবসর পেল না। ছিপ নৌকো উল্টে গেল মুহূর্তে। মানুষগুলো এদিক-ওদিক ছিটকে পড়লো জলে। মকবুল এবার ডিঙির লগি তুলে এলোপাতাড়ি ঠ্যাঙাতে লাগলো লোকগুলোকে। তারা জলে ডুবে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করছে।

ইন্দর এবারে বল্লম বাগিয়ে ধরেছে। কিন্তু বল্লমের কোঁচা মারতে তার দ্বিধা। যদি রক্তপাত না ঘটিয়ে কিছু করা যায়। ইন্দরের এক হাতে টর্চ, অন্য হাতে ধরা বল্লম। টর্চের আলোয় ইন্দর দেখলো, দুজন লোক নরম পলির ওপর দিয়ে জঙ্গলের দিকে যাচ্ছে। ঠিক এই মুহূর্তে শোনা গেল রাজা বাঘের ডাক। বাঘের ডাক শোনার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার মোড় ঘুরে গেল। যে লোক দুটি জঙ্গলের দিকে যাচ্ছিল, তাদের একজন ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে। আর একজন নরম পলির ওপর দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে। আরো যারা জলে ছিল, তারা তখন বাঘের ভয়ে ডিঙির ওপর উঠে ইন্দর আর মকবুলের পা জড়িয়ে ধরেছে।



ইন্দর টর্চের আলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ফেলছে। বাঘ আবার চাপা গর্জন করে উঠলো। এবারে টর্চের আলোর বৃত্তে ধরা পড়লো ভয়ংকর রাজা বাঘ। অদূরে খাঁড়ির ধারে হেতাল ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে বাঘটা মুখব্যাদান করছে। পলি কাদার উপর যে মানুষটি দাঁড়িয়ে ছিল সে তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। সামনে হেতাল ঝোপের পাশে টর্চের আলোর বৃত্তের মাঝখানে মূর্তিমান বিভীষিকার মতো দাঁড়িয়ে আছে রাজা বাঘ।

বাঘটার দিকেই দৃষ্টি সবার। যে কোনো মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটির ওপর। এতগুলো মানুষের সামনে একটি লোককে বাঘে ধরে নিয়ে যাবে, এটা ভাবাও যায় না।

ইন্দর চিৎকার করে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটির উদ্দেশে বলে উঠলো, কি হলো উঠে এসো।

ইন্দরের চিৎকারের সহেগ সহেগ লোকটি আঁ আঁ আওয়াজ করে নরম পলির ওপর লুটিয়ে পড়লো।

ইন্দর লক্ষ্য করলো বাঘটি সামনের পা দুটি ভাঁজ করে ঝুঁকে পড়েছে। বেস বোঝা যায়, ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্যোগ করছে বাঘটি। সে ইঙ্গিত মকবুলকে কি যেন বললে। ইন্দর ইঙ্গিতে মকবুলকে কি যেন বললে। ইন্দর আর মকবুল বল্লম হাতে একই সঙ্গে লাফিয়ে পড়লো নিচে। হাঁটু অন্ধি ডুবে গেল পলি কাদায়। দুজনেই উদ্যত বল্লম হাতে এগিয়ে চললো। আলোর বৃত্তটা তখনো বাঘের ওপর। বাঘটি যেন ভয় পেয়েছে। একবার হাই তোলার মতো ভঙ্গি করলো। পরপর দু-এ পা করে পিছু হঠে হেতাল ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাঘটি হেতাল ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হলেও ইন্দর, মকবুল ও আরো মানুষেরা সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে হেতাল ঝোপের দিকে। সুন্দরবনের চতুর বাঘের চরিত্র এরা জানে। যে কোনো মুহূর্তে সুযোগ বুঝে আবার কারো-না-কারো ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। যে লোকটি অচেতন হয়ে পড়েছিল, তাকে আড়াকোলা করে ডিঙির ওপর তুলে আনলো মকবুল। ইন্দরও সতর্কভাবে ফিরে এলো।

এবারে ইন্দর বেশ গলা চড়িয়ে বলে উঠলো, বলো, তোমরা কার সর্বনাশ করে এলে, নয়তো এক-এককরে সবাইকে নিচে ফেলে দেবো।

একটি লোক ভয়ে ভয়ে উত্তর দিলে, শোনো ভাই, বিশ্বাস করো, আমরা চোরের ওপর বাটপাড়ি করতে গিয়েছিলাম।

ইন্দর কৌতূহলী হলো। লোকটি ঘটনার কথা খুলে বললো। ষাটমাসে ডাকাতি করে ফিরছিল একদল। যারা কয়েক বছর আগে এদের বন থেকে সংগ্রহ করা মধু লুঠ করে নেয়। এবারে সুযোগ পেয়ে তার বদলা নিয়েছে। ডাকাত দলের দ্বিগুণে ছিল পাঁচ জন। কাছি দিয়ে তাদের বেঁধে রেখেছে এরা।

মকবুল জিজ্ঞাসা করলো, তোমাদের লুট করা টাকা কোথায়?

লোকটি বললে, জলের নিচে। ডিঙিই তোমরা ডুবিয়ে দিলে, আর জানতে চাইছো টাকা কোথায়?

এর মধ্যে হঠাৎ সার্চলাইট এসে পড়লো। তারপরই দেখা গেল একটা স্পীড বোট ছুটে আসছে।

দেখতে দেখতে এসে গেল সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর স্পীডবোট। তার সঙ্গে বাঁধা একটা ছইতোলা ডিঙি। ডিঙিতে পাঁচজন লোক জড়োসনো হয়ে বসে আছে।

সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর সান্থী কর্ণ সিং-এর সঙ্গে আলাপ আছে ইন্দরের। কর্ণ সিংকে সব ঘটনা খুলে বললো ইন্দর।

এবারে সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর লোকেরা ডুবে যাওয়া ছিপ নৌকোটাকে তুলতে বললো সেই ডিঙির লোকজনদের। তারপর ইন্দর আর মকবুলকে বললে কর্ণ সিং, তোমরা ঘরের ছেলে ঘরে যাও।

ইন্দর বললে, আমরা যে জঙ্গলের এদিকটা দেখবো ভেবেছিলাম।

কর্ণ সিং বললে, ও ভাবনাটা এখন মনের মধ্যেই রাখো। বুঝতেই তো পারছো এদিকের হালচাল। এখানে বাঘ কুমিরকে যত না ভয়, তার চেয়ে বেশি ভয় এই জল-ডাকাতদের, বুঝেছো?

ইন্দর বললে, কিন্তু আমাদের কাছে তো টাকা-পয়সা নেই, কি লুঠ করবে ওরা?

কর্ণ সিং হাসলো। বললে, তোমাদের ইচ্ছে আর সাহসকে বাহবা দিই। কিন্তু যা বলছি শোনো, আমাদের সঙ্গে ফিরে চলো।

ইন্দর আর মকবুলের মনটা খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু কর্ণ সিং-এর কথার পর তো আর কথা চলে না।

ছিপ নৌকোটা তুললো কজনে মিলে। তারপর নৌকোটাকেও বাঁধলো স্পীড বোটের সঙ্গে। ইন্দর আর মকবুলের ডিঙিও সেই সঙ্গে বাঁধা, কিন্তু পিছন দিকে।

স্পীড বোট ছুটে চললো খাঁড়ির ওপর দিয়ে। কিছুক্ষণ ছুটে এসে রায়মঙ্গল পড়লো। আকাশে চাঁদ। গাওদেশে ঘন কুয়াশা। কুয়াশা জড়ানো জ্যোৎস্নায় চারদিকের দৃশ্যপট স্বপ্নময় হয়ে উঠেছে।

বাঁশি বাজানো শখ মকবুলের। বাঁশের বাঁশি। একসময় সে বাঁশিতে সুর তুললো।

স্পীড বোটের সঙ্গে বাঁধা তিনটি ডিঙি। কুয়াশা বলেই কিছুটা অস্বাভাবিক গতিতে যাচ্ছে স্পীড বোট। মকবুলের বাঁশি একভাবে বেজে চলেছে।

এমন ঘটনাও ঘটে

আড়াআড়ি ভাবে একটা কেওড়া গাছ উপড়ে পড়ে আছে খাড়ির ওপরে। কিছুটা দূরে থেকেই চোখে পড়েছে তালেব মিয়ার।

তালেব মিয়ার মনে চিন্তা, ডিঙি নিয়ে যাবে কেমন করে! যদিও হাত-কুড়ালটা সঙ্গে আছে, কিন্তু ও গাছ কেটে খাড়ির পথ সাফ করতে দিন কাবার হয়ে যাবে। এদিকে ভাঁটার টানও লেগেছে খাড়ির জলে, আর খানিক বাদে ডিঙি ভাসাবার মতো জলও থাকবে না খাড়িতে।

আস্তে আস্তে ডিঙি নিয়ে কেওড়া গাছটার কাছে এলো তালেব মিয়া। গাছটা বেশ বড়সড়। অনেকখানি জায়গা জুড়ে পড়ে আছে। এ গাছ কেটে সাফ করা চাট্টিখানি কথা নয়।

ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে এই কাণ্ড। এর মধ্যে কখন শিকড়ের মাটি আলগা হয়ে গেছে, পড়ে গেছে ঝাঁকড়া মাথা কেওড়া গাছটা।

ডিঙির ওপর দাঁড়িয়ে এদিকে ওদিকে তাকালো তালেব মিয়া। দুধারে সুন্দরবনের কসাড় জঙ্গল। যেখানে মাটি সূর্যের আলোর ছোঁয়া পায় না।

সুন্দরবনের নাড়িনক্ষত্র জানে তালেব মিয়া। ছোটবেলা থেকে এই জঙ্গলের রাজ্যটা চষে বেড়াচ্ছে। ছোট বড় নদীগুলো শুধু নয়, বনের রাজ্যে মাকড়সার জালের মতো যত খাল, খাড়িয়ে আছে এ সব ওয় জানা। মাছ ধরতে, কাঠ কাটতে কিংবা মধু সংগ্রহে তোযায়ই, এ ছাড়া মাঝে মাজ নিজের খেয়ালে তার প্রিয় ছোট ডিঙিটা নিয়ে একাই বেরিয়ে পড়ে জঙ্গলের রাজ্যে। জোয়ারের টানে যায়, আবার ভাঁটার টানে ফিরে আসে। বনের রাজ্যে একা একা ডিঙি নিয়ে বেড়ানোটা ওর কাছে নেশার মতো।

আটষট্টি বছর বয়েস তালের মিয়ার-সেই শিশুকাল থেকে সে জঙ্গলের রাজ্যে ঘোরাফেরা করছে।

জঙ্গলের রাজ্যটা তার ভালো লাগে। এখানকার গাছপালা, বন্যপাখি, নদী-নালা, জন্তু-জানোয়ার, ফুল, পাখি-সবই তার প্রিয়। আজ অবধি কখনো জঙ্গলের পশুপাখি শিকার করেনি। জ্বালানীর জন্যে বাদাবন থেকে শুকনো ডালপালা সংগ্রহ করেছে, কিন্তু কখনো একটি তাজা গাছ কাটেনি। জঙ্গলের ওপর এমনই ভালোবাসা ওর।

এই ভালোবাসার ফলও পেয়েছে। জঙ্গলের রাজ্যে কতবার বিপদের মুখে পড়েও আশ্চর্যভাবে বেঁচে গেছে। সে সব গল্প শুনলে রূপকথার গল্প মনে হবে।

একবার চারদিকে দৃষ্টিপাত করলো তালেব মিয়া। তারপর ডিঙির কোণ থেকে ছোট্ট কুড়ালটা বার করলো। একটু ভাবলো, এরপর আল্লার নাম করে কোপ মারলো কেওড়া গাছের ডালে। প্রথম কোপ মারার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হলো গাছটা এখনো বেঁচে আছে। পরক্ষণে মনে হয় এ বাঁচা নয়। গাছটার শিকড় পর্যন্ত উপড়ে গেছে।

পরপর বেশ কয়েকটা ভাল কাটলো। তারপর বড় একটা ডালে কোপ মারতে গিয়ে কুড়ালটা মুঠো ফসকে পড়ে গেল খাড়ির জলে। তালের মিয়া তাজ্জব বনে গেল। কুড়ালটা আচমকা মুঠো থেকে ফসকে গেল কেন?

কুড়ালটা খুঁজে পাওয়াও তো মুশকিল, খাড়িতে এখনো চার পাঁচ হাত জল। তারপর জলের মধ্যে কোথায় পড়েছে কে জানে। আর কেওড়া গাছের ডালপালার মধ্যে জলে ডুবে কুড়াল খোঁজাও দায়।

জলে নামতে যাবে, এমন সময় ফোঁসফোঁসানি কানে এলো তালেব মিয়ার। পারের দিকে চোখ ফেরাতেই দেখলো, ভয়ঙ্কর বীভৎস একটা দানবের মতো কাঁকড়া একটা কেউটে সাপকে দাড়া দিয়ে ধরেছে। সাপটা ছোবল মারছে কাঁকড়ার শক্ত আবরণের ওপর। আর কাঁকড়াটা তার গাড়া দিয়ে ধরা সাপটাকে জলের দিকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে।

তালের মিয়া এতদিন এই জঙ্গলের রাজ্যে ঘুরেছে কিনা এমন ভয়ঙ্কর দৃশ্য কখনো তার চোখে পড়েনি। সর্বাস্থ শিউরে উঠলো কাঁকড়া আর কেউটের লড়াই দেখে।

সাপটার সামনে ছোবল মারছে আর কাঁকড়া সাপটাকে জলের দিকে নিয়ে যেতে চাইছে। জলের কাছাকাছি নেমে এসেছেও।

শেষ পর্যন্ত সাপটা দু টুকরো হয়ে গেল। লেজের দিকটা কাঁকড়া জলের মধ্যে নেমে গেল তরতর করে। কাঁকড়ার আজ মহাভোজ।

অর্ধেক শরীর নিয়ে কেউটেটা আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। নরম পল্লির উপর খানিকটা জায়গা রক্তে লাল হয়ে গেছে। কেউটেটা ভয়ঙ্কর আক্রোশে ফণা তুলে ফুঁসছে।

তালের মিয়া ভাবলো, এখন জলে নামা যাবে না, কালান্তক যদি চোখের সামনে। ক্ষ্যাপা কেউটের ছোবল মানে নিশ্চিত মৃত্যু।

ও সাপটাকে আর বাঁচিয়ে রাখা ঠিক নয়। হয়তো এমনিতে মরে যাবে, কিন্তু মরার আগে দু-একটা জীবন নিয়ে যাবে।

ডিঙির লগিটা তুলে নিয়ে কেওড়া গাছের গুঁইড়র ওপর উঠলো তালেব মিয়া। গুঁড়ির



ওপর দিয়ে পারের দিকে এলো। ঠিক করলো লগি দিয়ে কেউটেটাকে পলি কাদার মধ্যে পুঁতে দেবে।

কিন্তু অস্থির ক্ষ্যাপা কেউটেকে কিছুতেই বাগে আনতে পারছে না। লগির ওপরেই ছোবল মারছে কেউটে। শেষটা কোনমতে কেউটেটাকে নরম পলি-কাদার মধ্যে পুঁতে দিলে। কিন্তু পরক্ষণে পলিমাখা হিলহিলে শরীর নিয়ে বেরিয়ে এলো সাপটা। তালের মিয়াও যেন ক্ষেপে গেছে। বারবার সাপটাকে লগি দিয়ে খোঁচাতে লাগলো। শেষটা সাপটা স্থির হয়ে গেল। আর ফণা তুলতে পারছে না। শুধু কুন্ডলী পাকাচ্ছে। এবারে সাপটাকে সজোরে পলির মধ্যে গুঁজে দিলে। তবু তালের মিয়া চোখ রাখলো খানিক সময়, সাপটা আবার বেরিয়ে আসে কি না। না। সাপটা আর নরম পলি ঠেলে উঠে এলো না।

কেওড়া গাছের গুঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে একবার আকাশের দিকে তাকালো তালের মিয়া। সূর্য বেশ খানিকটা পশ্চিমে চলেছে। মাঘের সূর্য, আর কতক্ষণই বা আকাশে থাকবে। এদিকে খাড়ির জলও ভাঁটার টানে আরো খানিক নেমে গেছে। আর কিছুক্ষণ বাদেই জল-শূন্য হয়ে যাবে খাড়ি। গাছ কেটে ফেললেও তখন আর ডিঙি ভাসবার উপায় থাকবে না।

এমন বিপাকে কখনো পড়েনি তালের মিয়া।

এখান থেকে খাড়ি বরাবর হেঁটে গেলে শকুনখালির খাল এমন কিছু দূর নয়। বড়জোর ঘন্টাখানেক সময় লাগবে। কুড়ুলটা সঙ্গে থাকলে তাই তালের মিয়া। কিন্তু শূন্য হাতে এই জঙ্গলের পথে যাওয়া ঠিক নয়।

কিন্তু এই জঙ্গলের মধ্যে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে কতক্ষণ। বিপদ তো এখানেও।

কেওড়ার গুঁড়ি থেকে ডিঙিতে নামলো তালের মিয়া। মন থেকে ভাবনা ঝেড়ে ফেলা যায়। এখন যত চিন্তা তার কুড়ালটার জন্যে। ওটা ঠাকুর্দার আমলের কুড়াল। ঠাকুর্দা বলতো, এই কুড়ালটা হাতে রাখবি জঙ্গল মহলে গেলে। দেখবি কোনো বিপদ কাছে আসবে না। ঠাকুর্দা সেই কথা বলতো। আর তালের মিয়ার ধারণাও তাই। সে দেখেছে কুড়ালটা হাতে থাকলে মনে কোনো ভয় থাকে না।

সেই কুড়ালটাই আজ বেটেকর পড়ে গেল খাড়ির জলে।

একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল তালের মিয়া। হঠাৎ চমক ভাঙলো বানরের কিচিরমিচির শব্দে। আর সেই মুহূর্তে একদল পাখিও উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে।

বানরের এই কিচিরমিচির, পাখির উড়ে যাওয়া-এ সবের মানে বোঝে তালের মিয়া। সে বেশ বুঝতে পারে, বড় মিয়া অর্থাৎ রাজা বাঘ নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও এসেছে কিংবা আসছে। এই অরণ্য রাজ্যে বানর আর পাখিরা নিচের জন্তু-জানোয়ারদের সতর্ক করে দেয়-

পালাও বাঘ আসছে।

একদল বানর বসে আছে কেওড়া গাছের মগডালে। তালেব মিয়া ফিরে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে বানরগুলো ভীষণ চঞ্চল হলো, গাছের ডাল নাড়তে লাগলো জোরে জোরে। একটা বুড়ো বানর মুখ দিয়ে বিচিত্র আওয়াজ করতে লাগলো।

তালেব মিয়া বুঝলো, ভয়ঙ্কর বিপদ বুঝেই ওরা তাকে সাবধান করে ওই গাছেই উঠতে বলছে।

তালেব মিয়া ডিঙি থেকে লাফিয়ে পড়লো পায়ে। পায়ে নরম পলি, গাছে ওঠাই দায়। তবু হেতাল পাতায় কোনমতে পা ঘষে নিয়ে কেওড়া গাছে উঠতে আরম্ভ করলো। কিছুটা উঠেই দেখতে পেল মূর্তিমান ভয়ঙ্কর লাফ দেবার জন্যে তৈরি।

গায়ের রক্ত হিম হয়ে এলো তালেব মিয়ার। আর সেই মুহূর্তেই দেখলো একটা কেওড়া



গাছের ডাল এসে পড়লো বাঘটার মুখের ওপর। বাঘটা মুহূর্তের জন্যে অন্যমনস্ক হলেও পরমুহূর্তে ভয়ংকর গর্জন করে উঠলো।

ততক্ষণে তালেব মিয়া মরিয়া হয়ে আরো খানিকটা ওপরে উঠে এসেছে।

এবারে বানর দলের মধ্যে আনন্দের প্রকাশ দেখা গেল।

তালেব মিয়াও এখন নিরাপদ। গাছের ওপরের দিকে উঠে এসেছে সে। স্থির হয়ে বসেছেও।

সামনেই আর এক ডালে বুড়ো বানরটা তার দিকে তাকিয়ে যেন হাসছে।

পঁচিশ তিরিশটা বানর বসেছিল গাছে। হঠাৎ তারা আবার নিজেদের মধ্যে কিচির মিচির

আরম্ভ করে দিল। তারপর হঠাৎ কি হলো দশ-পনেরোটা বানর এ গাছ-ও গাছের ওপর দিয়ে চলতে লাগলো। ওরা শকুনখালির দিকে যাচ্ছে।

কেওড়া গাছের নিচে হেতাল ঝোপের কাছে বাঘটা নিশ্ফল আক্রোশে গর্জন করছে আর মাঝে মাঝে ভয়ংকর মুখব্যাদান করে ওপরের দিকে দেখছে।

তালেব মিয়ার পাশে বসা একটি বানর মাঝে মাঝে কেওড়া ডাল ভেঙে বাঘটার মুখের ওপর ফেলছে।

সূর্য অস্ত যাচ্ছে।

দেখতে দেখতে অন্ধকার নিবিড় হয়ে নামলো জঙ্গলের রাজ্যে। সঙ্গে ফিকে কুয়াশাও জমেছে।

বানরের দল এখনো তাকে ঘিরে বসে রয়েছে। তালেব মিয়ার চোখ মাঝে মাঝে পড়ছে নিচের দিকে। যেখানে অন্ধকারের মধ্যে বাঘের দুটো চোখ জ্বলছে।

তালেব মিয়া ভাবছে, যদি সারা রাত মাঘের শীত গায়ে নিয়ে এই গাছের ডালে বসে কাটাতে হয়।

তালেব মিয়া আবার সচকিত হলো। দূর থেকে ভেসে আসা বানরের কিচিরমিচির আওয়াজ শুনে। এরাই কি দল বেঁধে গিয়েছিল ওরা এবং কেন? আবার ফিরে এলোই বা কি জন্যে!

তালেব মিয়া মনের মধ্যে বিস্ময়!

সে বিস্ময় আরো গভীর হলো যখন তালেব মিয়া শুনতে পেল ক্যানেষ্টারা পেটানোর শব্দ। একটি নয়, অনেক ক্যানেষ্টারা পেটাতে পেটাতে কারা যেন জঙ্গলের মধ্যে আসছে।

এক সময় দূরে চোখ পড়লো তালেব মিয়ার। কুয়াশার জালের মধ্যেও দেখতে পেল অনেকগুলি আলো কাঁপছে।

বানর দলের মধ্যে তখন সে কী উল্লাস। আনন্দে গাছের ডাল নাড়ছে আর কিচিরমিচির করছে। এদিকে বাঘটাও ভয়ংকর শব্দে গর্জন করে উঠলো।

কিছুক্ষণের মধ্যে কৌতূহলের অবসান হলো। দুটো হাজারক আর অনেকগুলো মশাল জ্বালিয়ে বন্দুক, সড়কি, বল্লম নিয়ে ক্যানেষ্টারা পেটাতে পেটাতে একদল মানুষ এসে পৌঁছালো গাছের নিচে। বিপদ বুঝে বাঘটা তখন জঙ্গলের মধ্যে গা ঢাকা দিয়েছে।

যারা এসেছে তার মধ্যে তালেব মিয়ার বাড়ির ছেলেরা আর পড়শি জোয়ানেরা রয়েছে। গাছের ওপর থেকে তালেব মিয়া সকলকেই দেখেছে।

ডিঙি দেখে মানুষগুলো তখন ক্যানেষ্টারা পেটানো বন্ধ করেছে।

পতিরাম বৈদ্যর গলায় আওয়াজ জোরালো। ঠোঁটের ডগায় দুটি হাতের তালু শাঁখের মতো

করে হাঁক পাড়লো, অ তালেব মিয়া..... আ..... আ.....

ধ্বনি প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এলো।

তালেব মিয়ার কী যেন হয়েছে, সাড়া দেবে কিন্তু দিতে পারছে না। গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছে না। সব কিছু যেন তার কাছে স্বপ্নের মতো হচ্ছে।

অথচ এই মুহূর্তের যা কিছু সবই সত্যি।

শেষ পর্যন্ত সেই ঘোর ভাবটা কেটে গেল। তালেব মিয়া চিৎকার করে বললে, আমি এখানে-এই গাছে।

আনন্দে আবার ক্যানেশ্তারা পেটাতে আরম্ভ করলো নিচে জড়ো হওয়া লোকজন। বন্দুক ছিল দেবেন মাস্টারের হাতে, ফাঁকার দিকে একটা গুলিও ছুঁড়লো।

তালেব মিয়া সাবধানে নেমে এলো নিচে। একে ওকে জড়িয়ে ধরলো আনন্দে।

দল বেঁধে তখন সবাই খাড়ির পারে এসে দাঁড়ালো। ভাঁটার টানে জল নেমে গেছে। কাদার ওপর কাত হয়ে আছে ডিঙিটা। তালেব মিয়া দেখলো তার কুড়ালটা ভেঙে পড়া কেওড়া গাছের ডালে আটকে রয়েছে। তাড়াতাড়ি কাদার মধ্যে নেমে কুড়ালটা নিয়ে এলো তালেব মিয়া।

ডিঙি পড়ে রইলো। কাল জোয়ারের সময় এসে নিয়ে গেলেই হবে। ডিঙি তো আর ভেসে যাবে না, ভেঙে পড়া গাছে আটকে থাকবে।

ফেরার সময় বানর দলের কীর্তির কথা শুনলো তালেব।

ঠিক সন্ধ্যার মুখে একদল বানর শকুনখালির পারে একটা গাছে জড়ো হয়। ওদের ভাষায় চিৎকার করে সজোরে গাছের ডাল নাড়তে থাকে। সংকীর্ণ খাল-খালের ওপাড়েই গ্রাম। আর তালেব মিয়ার বাড়ি খালের পারেই।

খালপার দিয়ে যারা যাওয়া-আসা করছিল, তারা থমকে দাঁড়িয়ে বানরদের কান্ডকারখানা দেখতে থাকে। অবাকও হয়।

এদিকে তালের মিয়া যে জোয়ারের টানে ডিঙি নিয়ে বনের মধ্যে গেছে এবং এখনো ফেরেনি এ কথাটাও কানাকানি হয়ে ছড়িয়ে গেছে।

তালের মিয়ার বড় ছেলে মোকসেদও এলো। দেখলো বানরদের কান্ডকারখানা। আর তখনই তার মনে হলো, ওরা তার আব্বাজানের বিপদের কথা জানতে আসেনি তো! মনে পড়লো আব্বাজানের বিপদের কথা জানাতে আসেনি তো! মনে পড়লো আব্বাজানের কথা-জঙ্গলে আমার কোনো বিপদ হবে না, এ রাজ্যটারে আমি ভালোবাসি।

এরপরই মোকসেদই বললে দল বেঁধে বাদায় ঢোকান কথা।

দেখতে দেখতে পাড়ার লোকজন তৈরী হলো বনে যাওয়ার জন্যে। তারা যতক্ষণ না খাল

পেরিয়ে আসে ততক্ষণ বানর দল সামনে চিৎকার করেছে।

তালেব মিয়ার দু চোখে জল ঝরছে। বানরদের এ ঝগ সে শোধ করবে কি করে। তার মনে পড়লো বছর সাতেক আগেকার কথা। এই জঙ্গলে একটা শিশু বানর পাখিধরা জালে আটকা পড়েছিল, তালেব মিয়ার চোখে পড়ে। শিশু বানরটাকে সে মুক্ত করে দেয়। মনে আছে শিশু বানরটিকে ফিরে পেয়ে বানর পরিবার কি রকম আনন্দ প্রকাশ করেছিল।

আজ বানরেরা কি সেই দানের প্রতিদান দিলে?

আচমকা গাছের ডালে বসা বানরদের উদ্দেশে চিৎকার করে বললে তালেব মিয়া, কাল যখন ডিঙি নিতে আসবো তখন তোদের জন্যে দু কাঁদি পাকা কলা নিয়ে আসবো, তোরা থাকিস এখানে।

তালেব মিয়াকে নিয়ে দলবল এগিয়ে চললো। বানরের দল কচি কচি কেওড়ার পাতা ছড়িয়ে দিতে লাগলো সকলের মাথার ওপর।





বিপদ ঘটতে পারতো

শ্রাবণ মাস। তিন দিন অবিরাম বৃষ্টি ঝরছে। মুহূর্তের জন্যেও বৃষ্টি ঝরা বন্ধ হয়নি। তিন দিন তিন রাত সমানে বৃষ্টি হচ্ছে। কখনো বৃষ্টি ঝরছে মুঘলধারায়, কখনো টিপ টিপ করে।

মাঠ-ঘাট-পুকুর জলে ডুবে গেছে। রাস্তায় উপচে উঠেছে খাল-বিল-পুকুরের জল। ঘরের উটানেও জল থৈ থৈ করছে।

গ্রামের লোক কদিন প্রায় ঘর ছেড়ে বেরোয় না। কোথায় যাবে এই বৃষ্টির মধ্যে? হাট-বাজার বসছে না, কাজ-কারবারও বন্ধ। তিন দিনের বৃষ্টিতে যেন মানুষের দম বন্ধ হবার অবস্থা।

এই দুর্যোগে সেদিন দুপুরে মানুষের পূজোর দালানে পাঁচ প্রস্তুতে মিলে কাঁঠাল বিচি পোড়া, মুড়ি দিয়ে মজার জলযোগ করছিল। কাঁচালঙ্কা চাকনা দিয়ে তেলমাখা মুড়ি আর কাঁঠাল বিচি পোড়া-যে না খেয়েছে সে এর স্বাদ জানে না।

যা কিছু আয়োজন মানুর। চন্ডীর দোকানের লাল মুড়ি, সে-ই এনেছে। মুড়ির খরচ তার। আর কাঁঠাল বিচির জন্যে তো দোকানে ছুটতে হয়নি-বাড়িতেই ছিল। কাঁচা লক্ষা গাছের, তুলে আনতে যেটুকু সময়।

মানু, তার ছোট ভাই ভূজা আর আছে দোয়েল, লালটু আর কই। ওরা পাঁচজন বলতে গেলে একই বাড়ির। পাঁচজনে বেশ আসর জমিয়েছে।

ওরই মধ্যে লালটু একটু ডানপিটে, হঠাৎ তারই মাথায় একটা চিন্তা ঝিলিক দিয়ে উঠলো। বর্ষায় চারদিকে জল থৈ থৈ-কলার ভেলায় চেপে বেরিয়ে পড়লে কেমন হয়!

অত্যন্ত মুখরোচক কথা। কিন্তু মানু বললে, যদি জানতে পারে।

লালটু বললে, জানবে কি করে? জানতে দিলে তো।

দোয়েল যদিও এদের মধ্যে বয়সে বড়, কিন্তু কিছুটা ভীত স্বভাবের। বললে, এই বৃষ্টির মধ্যে যাওয়া কি ঠিক হবে?

মানু বললে, কলস্বাস সমুদ্র পাড়ি দিতে পেরেছিল আর আমরা কলার ভেলায় বিল পাড়ি দিতে পারবো না?

ভূজা বললে, সাহস চাই-সাহস বিস্তৃত বক্ষপট।

কাই গলার সুর আরো একটু চড়িয়ে বললে, জীবনে অ্যাডভেঞ্চার চাই-নইলে জীবন কি।

দোয়েলের মনে ভয়টা যেন আরো চেপে বসেছে। বললে, সবই তো বুঝলাম, কিন্তু এই বৃষ্টিতে চারদিকে সাপখোপ কিলবিল করছে।

লালটু খিঁচিয়ে উঠলো, হ্যাঁ-এখন যত অলঙ্কুনে কথা। তুই যাবি কিনা বল? যদি ভয় করে তবে ঘরে বসে থাক। তোকে যেতে হবে না।....কি বলিস মানু?

মানু বললে, না সে হয় না। আমরাও যাবো, দোয়েলও যাবে। কি দোয়েল যাবি তো?

দোয়েল মাথা নেড়ে সন্মতি জানালো।

এবার পাঁচ বন্ধু মিলে শলা-পরামর্শ হলো। ভেলায় অভিযান তাদের কি ভাবে শুরু হবে।

প্রথমে ওরা যাবে পুরানো বাগানে। তিনটি বড় কলাগাছ কেটে ভেলা বাঁধবে। যদি তিনটির বেশী লাগে তাতেও অসুবিধে নেই। কতগুলো আজো বাজে কলাগাছ রয়েছে বাঁশঝাড়ের কাছে। তাতে কলা হয় না বললেই চলে।

যাইহোক আর দেরী করা ঠিক নয়। এমনিতেই বেলা দুপুর। ভেলা বানাতে অন্তত আধঘন্টা সময় লাগবে। সুতরাং বেরিয়ে পড়া যাক।

কিন্তু কোন্ দিক থেকে বেরবে। সামনে দিয়ে বেরোতে গেলে কারো না কারো চোখে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। খিড়কির পাঁচিলের দরজা দিয়ে বেরোতে গেলেও বিপদ-ওদিকের ঘরে ছোটকা

থাকে। বিচার-আচার নয়, সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি।

একটু ভেবে চিন্তে মানু বললে, সামনে দিয়েই বেরিয়ে যাই-নিছক খোলা মন নিয়ে। তাতে কেউ যদি দেখে ফেলে, বলবো, “না, কোথাও যাচ্ছি না। ওই রাস্তায় মাছ না কি ভাসছে, তাই দেখতে যাচ্ছি।” আর মাছের কথা শুনলে সাত খুন মাপ।

ভূজা ছুটে চলে গেল বাড়ির ভিতর। দুটো ছাতা আর একটা কাটারি নিয়ে চলে এলো। এদিক-ওদিক তাকালো। না, কেউ নেই। এবারে দুটি ছাতায় পাঁচটি মাথা গুঁজে দিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

বাড়ির বাইরে অনায়াসে বেরিয়ে পড়লো ওরা পাঁচজন। আক কি-এবারে তড়ি-ঘড়ি ভেলা বানিয়ে অভিযান শুরু করা।

ওস্তাদ ছেলে লালটু। অধ্যস্তার মধ্যে চমৎকার ভেলা বানিয়ে ফেললো সে। তিনটি নয়, পাঁচ-পাঁচটি কলাগাছ কেটে বাঁশের বাথারি গুঁজে মজবুত ভেলা বানিয়ে ফেললো।

বটতলার কাছ থেকে বিল আরম্ভ। জল থৈ থৈ বিল। মনে হয় একটা নদী। মাইভঃ বলে ভেলা ভাসলো পাঁচ বন্ধু।

লালটুর হাতে বাঁশের লগি। লগি দিয়ে ভেলা সজোরে ঠেলেই বলে উঠলো, আমরা হলাম পঞ্চপান্ডব-চলেছি বিজয় অভিযানে।

মানু বললে, কি বিজয় করতে যাচ্ছি আমরা?

লালটু বললে, দিগ্বিজয়।

ঝম ঝম বৃষ্টির মধ্যে পঞ্চপান্ডব কলার ভেলা ভাসিয়ে চলেছে দক্ষিণের বিলে।

আকাশে জমাটবাঁধা ঘন কালো মেঘ। এত বৃষ্টি ঝরছে তবু মেঘের ভার হালকা হচ্ছে না। সমানে বৃষ্টি ঝরছে। এত জল কোথায় ছিল!

যদিও এখন দিন, তবু কেমন যেন অন্ধকার জড়িয়ে আছে। জল থৈ থৈ বিল। এক-একটা ছিপ আর ভেলা ভাসছে দূরে বদরতলার খালের কাছে। জেলে-মালোরা মাছ ধরছে। কিন্তু কাছাকাছি জন-মানবের চিহ্ন নেই।

লালটু একাই লগি দিয়ে ভেলা ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। যদিও জলে টান আছে, কিন্তু টানের বিপরীতে উজানের দিকেই যাচ্ছে। সরাসরি দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে গেলে মন্দিরঘাটার বুড়ো শিবতলা ওই দিকেই যেতে চায় সে।

ভূজা বলে, ওদিকে নয়, গোলাবাড়ির দিকে চলো লালটু।

লালটু বলে, না, গোলাবাড়ি তো ঘরের কাছে। দূরে না গেলে মজা কোথায়।

দোয়েলের মনের ভয় এখনো কাটেনি। বিলের মাঝ বরাবর আসার পরেও সে বলে ফিরে

চল্ লালটু।

লালটু নাটুকে কায়দায় বলে, ওরে ভীতু, কেন তুই মানুষ হয়ে জন্মেছিস। কিসের ভয়? আমরা এখন দামাল কিশোর, আমাদের অভিধানে ভয় বলে কিছু নেই। আমরা এগিয়ে যাবো-ভয়কে জয় করে এগিয়ে যাবো।

জল থৈ থৈ বিলের বুকে ভেসে চলেছে কলা-গাছের ভেলা। ওরা পাঁচ বন্ধু চলেছে মন্দিরঘাটার বুড়ো শিবতলার দিকে।

সমানে বৃষ্টি ঝরছে। দুটি মাত্র ছাতা। দোয়েল, মানু, ভূজা আর কাই ছাতার নীচে জড়সড় হয়ে বসে আছে। লালটু বৃষ্টিতে ভিজছে। শুধু গায়ের জামাটা খুলে মাথায় বেঁধেছে। মাথাটা অন্তত বাঁচুক জলের হতে থেকে।

বিলের মাঝ বরাবার জলের টান আছে। বিলের জল বদরতলার খাল দিয়ে ইছামতীতে গিয়ে পড়ছে। মন্দিরঘাটার বুড়ো শিবতলায় যেতে হলে খাল পেরিয়ে যেতে হবে। লালটু সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে-হঠাৎ না খালে গিয়ে পড়ে। কিন্তু খাল তো পেরোতেই হবে।

খালের পারে কাঠশোলা আর পিটুলি গাছ। ওই গাছগুলোই নিশানা। দু হাতে লগি ঠেলেছে লালটু, আর চোখ রেখেছে খালের দিকে।

কিন্তু চোখ রেখেছে খালের দিকে।

কিন্তু চোখ রাখলে কি হবে, খালের কাছাকাছি আসতেই জলের টান বাড়লো। লগি দিয়ে ভেলা সামলাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে সে। তবু পরোয়া নেই। লক্ষ্যে সে পৌঁছবেই।

আচমকা ভেলা পাক খেয়ে খালের জলে গিয়ে পড়লো। বাঁশের লগি দিয়ে থৈ পাওয়া যায় না।

দূরন্ত জলের টানে ভেলা ভেসে চললো বদরতলার দিকে।

বদরতলার খাল গিয়ে মিশেছে ইছামতীতে। যদি ভেলা ইছামতীতে গিয়ে পড়ে

মানু বললে, কি হবে লালটু, যদি ভেলা সামলাতে না পারিস?

লালটু বললে, কি আবার হবে। আমরা চলে যাবো নদীতে, তারপর নদী দিয়ে চলে যাবো অনেক দূরের সমুদ্রে। তারপর-

তারপর আর কি? -দোয়েল প্রায় কেঁদে ফেলেছে। বললে, তারপর আর কিছু নেই।

লালটু বললে, কেন? আমরা পাতালপুরীর দেশে চলে যাবো। রূপকথায় পড়িসনি পাতালপুরীর কথা। পাতালপুরী হলো মৎস্যকন্যার দেশ। যাদের মুখটা মানুষের মতন, আর দেহটা মাছের মতন। কি মজা হবে ভাবতো!

আর মজা! -ভূজা বললে, এখন ভালোয়-ভালোয় বাড়ি ফিরতে পারলে হয়। কাই ফোড়ন

কাটলো,-বাড়ি ফিরে গরম গরম খিচুড়ি আর পাঁপড় ভাজা।

মানু বললে, আর কিছু না? একটু করে কানমলা আর দু চারটে চাঁটি।

লালটু ধমকে উঠলো-ধ্যৎ, বাজে বকিস নে। চুপচাপ বসে থাক।

বেশ বোঝা গেল লালটু নিজেও কিছুটা ভয় পেয়েছে। কিন্তু মুখে তা প্রকাশ করবে না।

খালের পারে এক জায়গায় ঝাঁকড়া একটা ওড় চাকা গাছ। গাছের আশপাশে শিয়ালকাঁটার ঝোপ।

যে রকম ভেসে চলেছে ভেলা, তাতে যদি ওই ঝোপে আটকে যায় তা হলে রক্ষে, নয়তো নির্ঘাৎ নদীতে গিয়ে পড়তে হবে।

লালটু চোখ রেখেছে ওড় চাকা গাছ আর শিয়াল কাঁটার ঝোপের দিকে। চেষ্টা করছে জল কেটে যদি ভেলাটাকে একটু ঘোরানো যায়। কিন্তু অসম্ভব।

এবারে লালটু লক্ষ্য করলো, ওড় চাকার ডালপালা এসে পড়েছে খালের ওপর। একটা ডাল তো অনায়াসে ধরে ফেলতে পারবে সে।

গাছটা কাছে এসেছে। লালটু সতর্ক। যে কোনো ভাবে একটা ডাল সে ধরে ফেলতে পারবে।

ডাল ধরলো লালটু। লালটু সতর্ক। যে কোনো ভাবে একটা ডাল সে ধরে ফেলতে পারবে।

ডাল ধরলো লালটু। কিন্তু কিছুই হলো না। ডাল ধরে ঝুলে রইলো লালটু, আর পাক খেয়ে ভেলা গিয়ে আটকালো শিয়াল কাঁটার ঝোপে।

গাছের ডালে ঝুলতে ঝুলতে লালটু চীৎকার করলে, ভয় নেই, আমি ঠিক আছি।

ডাল বেয়ে লালটু গাছে গিয়ে উঠলো। ওই গাছ বেয়ে নিশ্চয়ই ভেলার ওপর লাফিয়ে পড়তে পারবে।

সাপ, সাপ,-চীৎকার করে উঠলো দোয়েল।

শুধু বলার অপেক্ষা, কাই বাঁশের লগি দিয়ে সজোরে আঘাত করলো সাপটাকে।

মার খেয়ে আহত সাপটা জলে গিয়ে পড়লো। জলের ওপরেও ফণা তুলতে চেষ্টা করছে সাপটা। কিন্তু একবার লগি গিয়ে মারতেই সাপটা নেতিয়ে পড়লো জলের ওপর। দূরন্ত জলের টানে ভেসে গেল সাপটা।

এদিকে লালটু গাছের ডাল বেয়ে ভেলার ওপর লাফিয়ে পড়লো। লগি হতে নিয়ে চেষ্টা করলো শিয়ালকাঁটার ঝোপ থেকে ভেলাটাকে বার করতে কিন্তু পারলো না। মেনভাবে আটকেছে ভেলা যে মুক্ত করার উপায় নেই।

এদিকে দিন শেষ হয়ে আসছে। অন্ধকার জড়িয়ে ধরছে চারদিক। আকাশের মেঘ আরো

যেন জমাট বাঁধছে। যদিও বৃষ্টির বেগ এখন কিছুটা কম, তবে দেখে মনে হচ্ছে আবার বৃষ্টি নামবে মুষলধারায়।

চারদিকে দৃষ্টিপাত করলো লালটু। কাছাকাছি কোনো নৌকা কিংবা ডোঙা দেখতে পেল না। আর পাঁচ জন একসঙ্গে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করলেও সে চীৎকারকারো কানে গিয়ে পৌঁছবে না। সুতরাং এই দুর্যোগের মধ্যে সারারাত এখানে অপেক্ষা করতে হবে।

সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে আবার নতুন করে মুষল ধারায় বৃষ্টি অন্ধকার। বিদ্যুতের ঝিলিকও নেই যে একবার চোখ বুলিয়ে নেবে।

বৃষ্টিতে ভিজে ওরা আমসি হয়ে গেছে। কাঁপুনি ধরেছে সর্বাস্থে। একে সেই থেকে জলে ভেজা, তারপর ভয়-রক্ত হিম হয়ে গেছে ওদের।

লালটু অকেঞ্চন কোনো কথা বলেনি, কিন্তু সাহসও হারায়নি সে। বসে বসে ফন্দি আঁটছে কি করে ফিরে যাবে। কিন্তু ভেবেও কোন কুল-কিনারা পেল না। শেষটা বললে, আয় আমরা সবাই মিলে গান গাই।

মানু বললে, এখন কি গান গাইবার সময় রে? তুই গা, আমরা শুনি।

লালটু বারকয়েক গলা ঝেড়ে গাইতে চেষ্টা করলো। কিন্তু গলা ঝাড়াই সার। গানের একটি কলিও সে গাইতে পারলো না। বললে, দূর, গান আমরাও আসছে না মানু।

দোয়েল বললে, তারচেয়ে রাম নাম জপ কর।

ভূজা বললে, রাম নামে ভয় কেটে যাবে। নে, আরম্ভ কর।

রাম, রাম, রাম-পাঁচজন রাম নাম করতে আরম্ভ করলো। খানিক সময় চললো রাম নাম উচ্চারণ, তারপর দোয়েল বললে,, কই, ভয় তো কাটছে না।

হঠাৎ এই সময়, গাছের ওপর কাঁা কাঁা আওয়াজ উঠলো। বিস্ত্রী আওয়াজ।

শিউরে উঠলো সবাই। লালটু বললে হয়তো কোনো সাপ গাছের ডালে উঠে পাখিটাখি ধরেছে।

সাপের কথায় ভয় আরো চেপে বসলো। সেই আহত সাপটা যদি ফিরে আসে! যদি সে প্রতিশোধ নিতে চায়।

পাঁচ বন্ধু জড়াজড়ি করে বসে ভেলার মাঝখানে। যদিও অন্ধকার তবু পাঁচ জোড়া চোখ তাকিয়ে আছে। যদি আহত সাপটা ফিরে আসে সেই চিন্তায়।

আচমকা এক ঝলক আলো এসে পড়লো ওদের চোখের মুখে। কিন্তু পরমুহূর্তে অন্ধকার আবার ঘন হয়ে উঠলো। আবার আলোর ঝলক।

লালটু উঠে দাঁড়ালো। একটা তীব্র আলো এগিয়ে আসছে।

চীৎকার করে উঠলো লালটু, আমরা এখানে এদিকে আসুন।

কোন কণ্ঠস্বর কানে এলো না। শুধু আলোটা ঘুরে ফিরে বারবার জ্বলতে নিবতে লাগলো।

আলেয়া নয় তো?

না, আলেয়া নয়-আলো। আলোটা এদিকেই আসছে। এক সময় আলোর বৃত্তটা স্থির হলো ওদের পাঁচ বন্ধুর ওপর।

-তোরা এখানে? ছোট্কার কণ্ঠস্বর।

-আমরা.....আমরা.....

-থাক্, আর বলতে হবে না।-ছোট্কা জীবন মাঝির ডিঙি নিয়ে এসেছে। জীবন ছাড়া আরো দু-জন রয়েছে ডিঙিতে।-আয় উঠে আয় সব।

ভালো ছেলের মতন এরা পঞ্চপান্ডব উঠে এলো জীবন মাঝির ডিঙিতে।

ছোট্কা বললে, বাড়ি চল সব্ দেখবি কেমন মজা।

সবাই চুপচাপ। কিন্তু মানু জানে তার ছোট্কা কে। মুখে যাই বলুক আসলে তাদের মতই মনের দিক থেকে ছেলেমানুষ ছোট্কা। আর তার মনে পড়লো, কদিন আগে ছোট্কাই কলাগাছের ভেলায় করে অভিযানে যাওয়ার গল্প শুনিয়ে ছিল।

গলায় সাহস এনে মানু বললে, জানো ছোট্কা, তুমি সেই যে সেদিন গল্প বলেছিলে, তোমরা ভেলায় চেপে ভূতের রাজ্য দেখতে বেরিয়ে ছিলে, আমরাও তেমনি-

ছোট্কা কে মুহূর্তেই বদলে গেল। বললে, কিন্তু কি করলি তোরা? কিছু না। যত সব ভীতুর দল। আলো দেখে 'আমরা আমরা' করে চীৎকার করছিলি কেন? আর বীরত্ব দেখাতে হবে না। এখন বাড়ি চলো।

লালটু কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই ছোট্কা বললে, আমি ছিলাম বলে বেঁচে গেলি-বুঝলি?
